রানি হাটশেপসুটের মমি

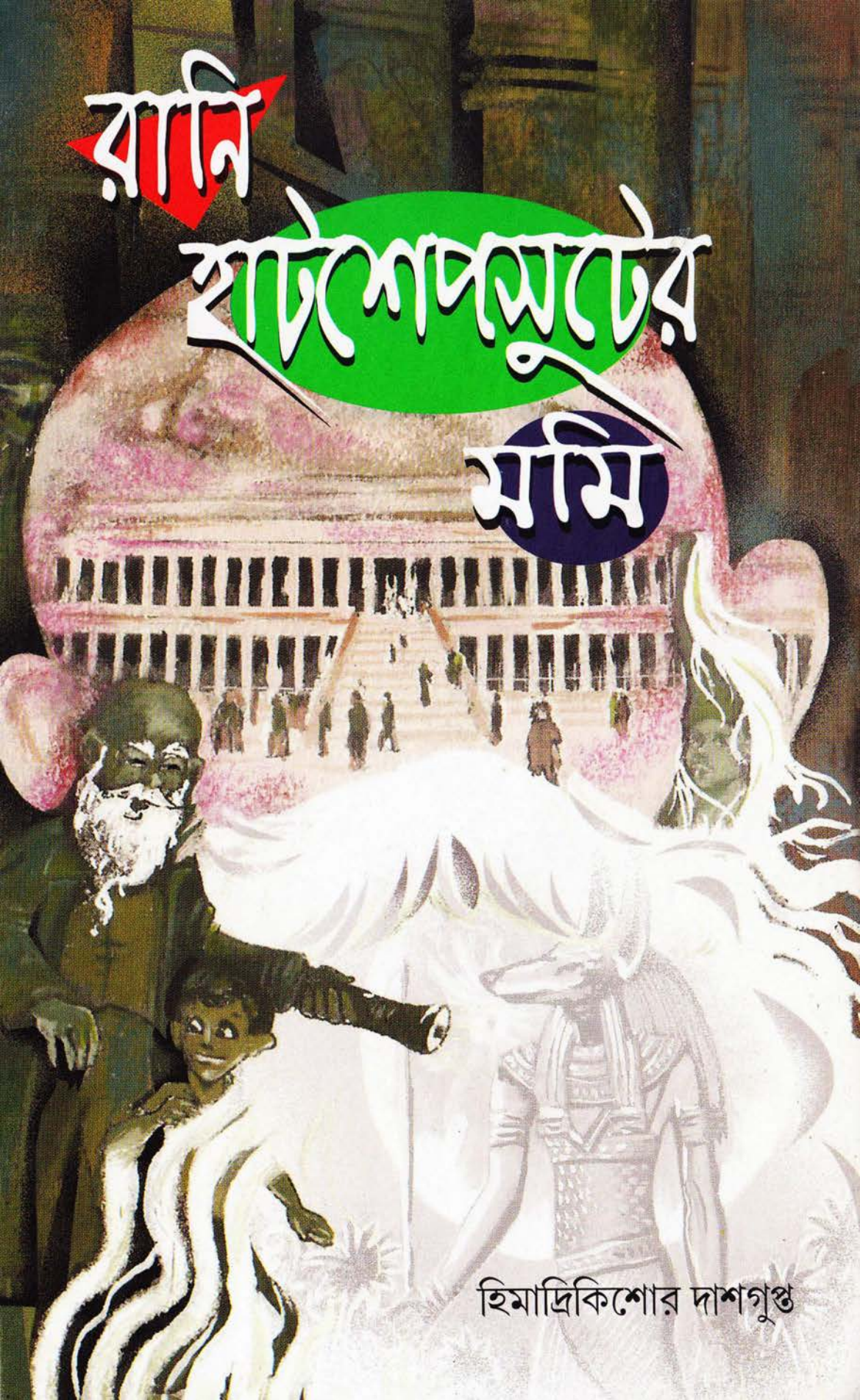

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

রানি হাটশেপসুটের মমি

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

শিশু সাহিত্য
সংসদ

RANI HATSHEPSUTER MUMMY
(The Mummy of Queen Hatshepsut)
by Himadrikishor Dasgupta

ISBN 978-81-7955-154-7

© পাঠ্যবস্তু লেখক
পুস্তকসজ্জা ও অলংকরণ প্রকাশক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ অমিত কুমার

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৪

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রকাশক দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক এ.পি. প্রিন্টার্স, ৮/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা-৭০০ ০৬৭

উৎসর্গ

আমার প্রয়াত পিতৃদেব
শৈলেন্দ্রকিশোর দাশগুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশে

মৃত্যুর দেবতা আনুবিস।

রয়াল জর্ডেনিয়ান এয়ারলাইনের বিমান যখন কায়রোর মাটি ছুঁল তখন স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে দশটা। আমাদের কায়রো পৌঁছোবার কথা ছিল সকাল সাতটা নাগাদ। কিন্তু রানওয়েতে কী একটা সমস্যার জন্যে আম্মানের কুইন অলিয়া এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের বিমান নির্ধারিত সময়ের ঘণ্টা চারেক পরে আকাশে উড়ল। কলকাতার নেতাজি সুভাষ বিমানবন্দর থেকে জর্ডনের রাজধানী আম্মানে পৌঁছোতে সময় লাগল সাত ঘণ্টা। আর আকাশে ওড়ার পর জর্ডন থেকে কায়রো পৌঁছোতে সময় লাগল আরও এক ঘণ্টা। কুইন অলিয়া এয়ারপোর্টে বসে থাকতে থাকতে বিরক্তি ঝরে পড়ছিল ডা. ঘটকের চোখে-মুখে। বারবার ঘড়ি দেখছিলেন তিনি। আমি আর অংশু লক্ষ করছিলাম সবকিছু। সত্যি কথা বলতে আমার কিন্তু খুব একটা খারাপ লাগছিল না বসে থাকতে। কত রকমের যাত্রী আসা-যাওয়া করছে। বিচিত্র তাদের সাজপোশাক, বিচিত্র তাদের ভাষা।

এসব দেখতে দেখতে দিব্যি আমার সময় কেটে গেল। তা ছাড়া মনের মধ্যে একটা আলাদা রোমাঞ্চ তো আছেই। এই প্রথম আমি বিদেশ সফরে বেরিয়েছি। তাও আবার আমার সফর মিশরের মতো প্রাচীন সভ্যতার দেশে। পিরামিডের দেশে! নীলনদের দেশে! ডা. ঘটকের অবশ্য এ ব্যাপারে খুব একটা বহিঃপ্রকাশ নেই। হয়তো ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, তাঁর এই মিশর ভ্রমণ প্রথমবার হলেও এর আগে তিনি অনেকবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। মিশর দেশটা সম্বন্ধে খুব একটা বেশি ধ্যানধারণা আমার নেই। কলকাতা থেকে আসবার আগে আমার এক বন্ধু আমাকে একটা বই দিয়েছিল। বইটার নাম 'দ্য আইজ অব দ্য স্ফিংক্স'। মিশরের পটভূমিতে বইটা দানিকেনসাহেবের লেখা। প্লেনে আসবার সময় বইটার কিছু অংশ আমি পড়ে ফেলেছি। দেশটা সম্বন্ধে সামান্য কিছু ধারণা হয়েছে।

কায়রো বিমান বন্দরে ভিসা পরীক্ষা, কাস্টমস পরীক্ষা, ট্যাগ মিলিয়ে লাগেজ বুঝে নেওয়া ইত্যাদি সারতে আরও তিরিশ মিনিট সময় লাগল।

BanglaBook.org

শেষে একসময় আমরা 'এগজিট' লেখা কাচের দরজার বাইরে পা রাখলাম। বাইরে বেশ ভিড়। আমরা আমাদের লাগেজ একপাশে রেখে সরে দাঁড়ালাম। ডা. ঘটকের চোখ চারপাশে খুঁজতে লাগল তাঁকে, যাঁর আমন্ত্রণে ডা. ঘটক এবং তার সঙ্গী হিসেবে অংশু ও আমার এই বিদেশ ভ্রমণ। মিনিট পাঁচেক সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ দেখলাম, একজন বেশ বয়স্ক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। মাথায় তাঁর বিশাল টাক, আর সবচেয়ে আকর্ষক, বুকের নীচ পর্যন্ত নেমে আসা ধবধবে সাদা দাড়ি। ভদ্রলোককে দেখতে পেয়েই হাসি ফুটে উঠল ডা. ঘটকের মুখে। কাছে আসার পর ভদ্রলোক এমনভাবে ডা. ঘটককে জড়িয়ে ধরলেন যে, তাঁর শীর্ণ দেহ প্রায় ঢাকা পড়ে গেল ভদ্রলোকের বিশাল চেহারার আড়ালে। বুঝতে অসুবিধে হল না, ইনিই ডা. ঘটকের দীর্ঘ দিনের বন্ধু, মিশর-গবেষক ও শল্যচিকিৎসক ডা. নাসের। যাঁর কথা আমি ডা. ঘটকের মুখে অনেকবার শুনেছি। আলিঙ্গান মুক্ত হওয়ার পর ডা. ঘটক আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি সৌরভ সেন, একজন তরুণ লেখক।'

এভাবে আমার পরিচয় দেওয়ায়, সত্যি কথা বলতে আমি একটু লজ্জাই পেলাম। আমি একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সাধারণ চাকরি করি, আর একলা মানুষ বলে সময় কাটাবার জন্য মাঝেমাঝে একটু-আধটু লেখালিখির চেষ্টা করি মাত্র, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। ডা. নাসের আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'আমাদের এই প্রাচীন সভ্যতার দেশে আমি আপনাকে স্বাগত জানাই। আশা করি এ দেশ থেকে আপনি লেখার জন্য প্রচুর রসদ সংগ্রহ করতে পারবেন।'

উত্তরে আমি বললাম, 'আপনার মতো পণ্ডিত মানুষ পাশে থাকলে অবশ্যই পারব।'

ডা. নাসের বললেন, 'আমি পণ্ডিত নই, পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন এই দেশ সম্পর্কে কিছুটা পড়াশোনা করি মাত্র। বলতে পারেন, এটা আমার একটা নেশার মতো।'

বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক যথেষ্ট বিনয়ীও বটে। স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের দু-জনের কথা হল। কিন্তু ইংরেজিতেই। আমার সঙ্গে কথা বলার

BanglaBook.org

পর ডা. নাসের অংশুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি তো অংশু!' তারপর তিনি অংশুর দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আমাকে চেনো?'

অংশু ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

ডা. নাসের অংশুর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আমি নাসের, আমি তোমার বৃদ্ধ বন্ধু।'

অংশু হেসে ফেলল তাঁর কথা শুনে।

এর পর ভিড় ঠেলে ডা. নাসেরের পিছন পিছন গিয়ে আমরা হাজির হলাম এয়ারপোর্টের পার্কিং জোনে। সেখানে অনেক গাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল একটা কালো রঙের লিমুজিন। ডা. নাসের পকেট থেকে চাবি বের করে ডিকি খুলে ফেললেন। আমরা আমাদের লাগেজ তার মধ্যে রাখার পর তিনি ডিকি বন্ধ করে উঠে বসলেন চালকের আসনে। ডা. ঘটক আমাকে ডা. নাসেরের পাশে বসতে বলে অংশুকে নিয়ে বসলেন পিছনের আসনে। পার্কিং জোনের বাইরে বেরিয়ে মসৃণ রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করল গাড়ি। ঝকঝকে রাস্তা, দু-পাশে বিরাট বিরাট বাড়ি, আধুনিক শপিং মল, চোখে পড়ছে দু-একটা মসজিদও। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি, তবে সকলেই চলছে নিয়ম মেনে। রাস্তার মোড়ে স্বয়ংক্রিয় সিগনালিং সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের গতি। রেলিং-ঘেরা ফুটপাত দিয়ে হেঁটে চলেছে বহু মানুষ। তার মধ্যে যেমন আছে স্থানীয় মানুষ, তেমনই মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে বিশাল বপু কুচকুচে কালো আফ্রিকান ও আমরা যাদের চলতি কথায় 'সাহেব' বলি, সেই সাদা চামড়ার মানুষও।

গাড়ি চালাতে চালাতে ডা. নাসের বললেন, 'আমি আপনাদের থাকার জন্য এখানে একটা ভালো হোটেলের ব্যবস্থা করেছি। আমরা এখন যাচ্ছি সেই হোটেল রোসেটাতে। রোসেটা কায়রোর অন্যতম সেরা হোটেল। আসলে আমি একা মানুষ, ছোট্ট একটা দু-কামরার ফ্ল্যাটে থাকি। তার অর্ধেক আবার বইপত্র আর নানা জিনিসে ভরতি। সেখানে থাকতে আপনাদের কষ্ট হত, তাই এই ব্যবস্থা।' এর পর ডা. নাসের আমার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'আপনি রোসেটা শব্দের মানে জানেন?'

কথাটা আগে যেন আমি পড়েছিলাম বা শুনেছিলাম, কিন্তু তার সম্বন্ধে কিছুই আর মনে করতে পারলাম না। তাই ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলাম, না।

BanglaBook.org

গাড়ি চালাতে চালাতে ডা. নাসের বলতে লাগলেন, 'রোসেটা হল সেই পাথর, যা দিয়ে হাইয়ারোগ্লিফ বা প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী যখন মিশরে প্রবেশ করে, তখন তাঁর সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন বুখার্ড রোসেটা শহরের সেন্ট জলিয়ান দুর্গের কাছে মাটির তলা থেকে এই পাথর উদ্ধার করেন। সেদিন দৈবক্রমে যদি তাঁরা পাথরটা উদ্ধার না করতেন, তাহলে এই সুমহান সভ্যতার ইতিহাসের বেশির ভাগটাই আজও আমাদের অজানাই থেকে যেত, যেমন ঘটেছে পেরু ইনকা সভ্যতার ক্ষেত্রে।'

ডা. ঘটক এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এই লিপির পাঠোদ্ধার প্রথম কে করেন?'

ডা. নাসের বললেন, 'ফরাসি পণ্ডিত ফাঁসোয়া শাঁপেলিয়ঁ ও ইংরেজ পণ্ডিত টমাস ইয়ং এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন। তবে এ দু-জনের মধ্যে শাঁপেলিয়ঁই প্রথম এর মর্ম উদ্ধার করতে সক্ষম হন। গ্রিক ভাষায় হাইয়ারোগ্লিফিকা শব্দের অর্থ পবিত্র চিহ্ন। এই শব্দ থেকেই হাইয়ারোগ্লিফ বা হাইয়ারোগ্লিফিক শব্দের উৎপত্তি। রোসেটা স্টোনের উপর হাইয়ারোগ্লিফিক, গ্রিক ও ডিমোটিক লিপিতে ফ্যারাও টলেমির তিনটি অনুশাসন খোদিত ছিল। রানি ক্লিওপেট্রার কথা সর্বপ্রথম রোসেটা স্টোনেই পাওয়া যায়।'

BanglaBook.org

ডা. নাসেরের কথা শুনে বুঝতে পারলাম এসব বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আছে। আমরা এর পর ডা. নাসেরকে বর্তমান মিশর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, আর তিনিও সুন্দরভাবে একের পর এক উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমরা একসময় পৌঁছে গেলাম হোটেল রোসেটাতে।

রোসেটা বিরাট বড়ো হোটেল, নির্মাণশৈলীতে গ্রিক স্থাপত্যের ছাপ স্পষ্ট। গাড়ি থেকে নেমে জিনিসপত্র নামানোর পর ডা. নাসেরর পিছু পিছু কাচের দরজা ঠেলে হোটেলের ভিতর ঢুকলাম। নীল রঙের নরম কার্পেটে পা ডুবে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বিশাল হলঘরের মধ্যে রাখা আছে বেশ কয়েকটি মহার্ঘ সোফা। মাথার উপর জ্বলছে ঝাড়বাতি। ঘরের একপাশে রিসেপশন কাউন্টারের ওপাশে বসে ছিলেন গোলগাল চেহারার মধ্যবয়সি একজন লোক। তাঁর নাম মনে হয় আল মামুন। কারণ, তাঁর সামনে রাখা একটা পিতলের ফলকে ওই নামটাই শোভা পাচ্ছিল। আল মামুন ডা. নাসেরকে দেখে এমনভাবে ঘাড় নেড়ে হাসলেন, তাতে আমার মনে হল, তিনি ডা. নাসেরের পূর্বপরিচিত।

তাঁদের দু-জনের মধ্যে স্থানীয় ভাষায় দু-চারটে কথা হল। ভাষাটা সম্ভবত আরবি। কারণ, গাড়িতে আসার সময় ডা. নাসেরের কাছে শুনেছি, এখানকার স্থানীয় মানুষরা নিজেদের মধ্যে সাধারণত আরবিতে কথা বলেন, অবশ্য ইংরেজিতে কথা বলারও চল আছে। আল মামুন একটা রেজিস্টার খাতায় আমাদের নাম-ঠিকানা লেখার পর তাতে ডা. নাসের আর ডা. ঘটক দু-জনই সই করলেন। আল মামুন বেল টিপে ডাকলেন দু-জন বয়কে। তারা আমাদের জিনিসপত্র তুলে নিল। মিনিট তিনেকের মধ্যেই লিফটে আমরা পৌঁছে গেলাম পাঁচ তলায় আমাদের সুইটের সামনে। থাকার জায়গাটা দেখে সকলেরই খুব পছন্দ হল। পায়ের তলায় পুরু কার্পেট, ঝকঝকে পালিশ করা কাঠের আসবাবপত্র, দুধ-সাদা বিছানা, নীল রঙের দেওয়ালে টাঙানো উজ্জ্বল সোনালি ফ্রেমে বন্দি বহু বর্ণের মিশরের চিত্রকলা। বিরাট ড্রয়িং কাম ডাইনিং স্পেসকে ঘিরে বিপরীতমুখী দুটো বড়ো বড়ো ঘর, দামি টাইলস-বসানো অ্যাটাচড বাথ আর পশ্চিমে রাস্তার দিকে খোলা বারান্দা। ভিতরে ঢুকেই এক পা দু-পা করে অংশু গিয়ে দাঁড়াল বারান্দার দিকে, তারপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নীচে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে ডা. নাসের বললেন, 'ও কি জানে, এটা ওর পিতৃভূমি?'

ডা. ঘটক বললেন, 'না।'

ডা. নাসের কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে চাইলেন না। কিছু কথাবার্তার পর

BanglaBook.org

তিনি ডা. ঘটকের কাছে জানতে চাইলেন, বিকেল বেলা আমরা রেস্ট নেব কি না, না হলে তিনি সাড়ে চারটের সময় আমাদের কায়রো মিউজিয়াম দেখাতে নিয়ে যাবেন। ঘড়িতে বারোটা বাজতে পাঁচ, আমি আর ডা. ঘটক দু-জনেই হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। ডা. ঘটক আমাকে বললেন, 'কী, যাবে নাকি সৌরভ? এখনও চার ঘণ্টার বেশি সময় আছে, এর মধ্যে স্নান-খাওয়া সেরে ঘণ্টা দুই বিশ্রামও নিয়ে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া সন্ধ্যের পর হোটেলে ফিরে তো কোনো কাজ নেই! কাজেই মিউজিয়াম থেকে ফিরে তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়া যাবেখন।'

আমি বললাম, 'আমার কোনো অসুবিধে নেই, দেখার জন্যই তো এসেছি।'

ডা. ঘটক বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' এর পর তিনি ডা. নাসেরকে জানিয়ে দিলেন যে, বিকেল সাড়ে চারটেয় আমরা তৈরি হয়ে থাকব।

ডা. নাসের আমাদের অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন নিজের কাজে। তাঁকে বিদায় জানিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে ডা. ঘটক আমার উদ্দেশে বললেন, 'জানো সৌরভ, আমার বাবা একটা কথা বলতেন, কোনো জায়গায় বেড়াতে গেলে যেটা প্রথমে দেখার সুযোগ পাবে সেটা দেখে নেওয়াই ভালো। না হলে অনেক সময় তা আর দেখাই হয় না। পরবর্তীকালে দেখেছি কথাটা সত্যি। সেবার যখন প্যারিস গেলাম, ঘরের কাছেই ল্যুভর মিউজিয়ম। ভাবলাম চারদিন তো থাকব, তার মধ্যে একদিন ঘুরে আসব সেখানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যাওয়াই হল না।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমারও এরকম হয়েছে দু-একবার।'

এক ঘণ্টার মধ্যেই স্নান-খাওয়া হয়ে গেল আমাদের। ডাইনিং-এ খাবার পৌঁছে দিয়েছিল হোটেলের লোকেরা। তার মধ্যে ছিল চাপাটি, মুরগির মাংস, কীসের একটা নিরামিষ তরকারি, বিনের সুপ আর দু-রকমের শুকনো মিষ্টি। খাবার পর এক ঘণ্টা গড়িয়ে নেওয়ার জন্য শুয়ে পড়লাম আমরা। ডা. ঘটক শুলেন একটা ঘরে, আর অংশুকে নিয়ে আমি শুলাম তার উলটো দিকের ঘরটায়। বিছানায় শোওয়ার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই অংশুর চোখ বুজে এল, ঘুমিয়ে পড়ল ও। আমার কিন্তু ঘুম এল না। নতুন কোথাও গেলে এই একটা সমস্যা আমার হয়।

BanglaBook.org

নতুন পরিবেশে ঘুম আসতে আমার একটু সময় লাগে। শুয়ে শুয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম অংশুর মুখের দিকে। অংশুকে দেখতে খুব সুন্দর। একমাথা কোকড়ানো চুল, ফরসা গোলগাল মুখে টিকোলো নাক, টানা টানা চোখ, তার উপর ভুরু দুটো মনে হয় যেন তুলি দিয়ে আঁকা। ঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, আসলে এই অরফ্যান অংশু এক বিশেষ অসুখে ভুগছে, তাকে দেখবেন বলেই ডা. ঘটককে, অংশুকে সঙ্গে নিয়ে দিন সাতেকের জন্য কায়রো ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন ডা. নাসের। আর ডা. ঘটক তাঁর ভ্রমণের জন্য সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেন তাঁর অসমবয়সি বন্ধু এবং দাবা খেলার সঙ্গী অর্থাৎ আমাকে। ডা. ঘটকের মতো আমারও সংসার বলে কোনো কিছু নেই, কাজেই এই লোভনীয় প্রস্তাবে রাজি হতে আমার দেরি হয়নি।

আমি অংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম তার দুর্ভাগ্যের কথা, তার অদ্ভুত অসুখের কথা। সত্যিই কি সেটা কোনো জটিল অসুখ? নাকি এর মধ্যে অন্য কিছু ব্যাপার আছে! যে কারণে ডা. নাসের অংশুর প্রতি এতটা আগ্রহী। আর একটা প্রশ্নও হঠাৎ আমার মাথায় এল। অংশুর সঙ্গে ডা. ঘটকের যোগাযোগ, অংশুর মাতৃভূমির মাটিতে পা রাখা, এ সবই কি কাকতালীয়, নাকি এর মধ্যেও অন্য কোনো ব্যাপার কাজ করছে। এসব হিজিবিজি নানা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঘড়িতে দেখি, চারটে বাজতে চলেছে। অংশুর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম তৈরি হয়ে নেওয়ার জন্য। ঠিক ওই সময় তাঁর ঘর থেকে ডা. ঘটকের গলা শোনা গেল, 'সৌরভ, এবার উঠে পড়ো! তৈরি হতে হবে, চারটে কিন্তু বাজে।'

এ ঘর থেকে আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, আমরা উঠে পড়েছি।'

আবার তাঁর গলা শোনা গেল, 'তোমার ক্যামেরাটা সঙ্গে নিয়ো কিন্তু!'

আমি বললাম, 'আচ্ছা।'

BanglaBook.org

২

ঠিক সাড়ে চারটেয় আমরা ডা. নাসেরের গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম আল-তাহরির স্কোয়ারের কায়রো মিউজিয়ামের উদ্দেশে। নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট দশেক আগেই আমাদের ঘরের দরজায় টোকা দিয়েছিলেন ডা. নাসের।

আমরাও তৈরি হয়েছিলাম, কাজেই বেরিয়ে পড়তে কোনো অসুবিধে হল না। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা এসে পৌঁছোলাম কায়রো মিউজিয়ামের সামনে। বিরাট লাল রঙের বাড়ি, তার সাদা তোরণ। ডা. নাসের বললেন, তাঁর নিজের ভিতরে প্রবেশের জন্য বিশেষ অনুমতিপত্র আছে। তাই তাঁর কোনো টিকিট লাগবে না। মিউজিয়ামে মাথাপিছু প্রবেশ মূল্য ২০ ইজিপ্সিয়ান পাউন্ড। আর ক্যামেরার জন্য ১০ ইজিপ্সিয়ান পাউন্ড। আমাদের তিন জনের টিকিটের দাম সৌজন্য দেখিয়ে ডা. নাসের দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমরা দিতে দিলাম না।

টিকিট কাটার পর আমরা ঢুকলাম মিউজিয়ামে। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে ডা. নাসের বললেন, 'আপনাদের যে রোসেটা স্টোনের কথা বলছিলাম তখন, তার একটা প্রতিলিপি এখানে রাখা আছে। আছে আরও বেশ কয়েক হাজার প্রত্নবস্তু। সেসব মোটামুটিভাবে দেখতে হলে অন্তত ঘণ্টা পাঁচেক সময় লাগে। আজ হাতে সময় অল্প, ঘণ্টা দুয়েক পরেই মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আজ আমি আপনাদের মিউজিয়ামের বিশেষ কিছু দেখার জিনিস আর মিউজিয়ামের প্রধান আকর্ষণ তুতানখামেনের গ্যালারি দেখাব। পরে একদিন হাতে সময় নিয়ে এসে বিভিন্ন খুঁটিনাটি জিনিস দেখিয়ে নিয়ে যাব।'

BanglaBook.org

ভিতরে ঢোকার আগে কাপড়ের জুতো পরতে হল। একতলার বিশাল হলঘরে ঢুকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। মনে হল, হঠাৎ যেন একটা অন্য জগতে এসে হাজির হয়েছি। চারপাশে ছড়িয়ে আছে অজস্র প্রাচীন মূর্তি, পাথরের ফলক, নানা ধরনের ছবি। মিউজিয়ামের বিরাট এই প্রদর্শনী-কক্ষে লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। চারপাশে কীরকম একটা গা ছমছমে পরিবেশ। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন মূর্তিগুলি যেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আমাদের। অংশু ভিতরে ঢুকবার পর আমার হাতটা জড়িয়ে ধরল। মনে হল, ও যেন মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছে। ডা. নাসের বললেন, 'আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন, আমি আপনাদের সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

ডা. নাসের প্রথমে গিয়ে দাঁড়ালেন বিরাট এক পাথরের মূর্তির সামনে। পাথরের সিংহাসনের উপর বসে আছে মূর্তিটি। সেটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'এটা হল প্রাচীন মিশরের বিখ্যাত রাজা বা ফারাও খিওপিসের মূর্তি। যিনি

ফারাও খুফু নামেই বেশি পরিচিত। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে অর্থাৎ যে সময়কালকে মিশরের ইতিহাসে ওল্ড কিংডম বলে চিহ্নিত করা হয়, সেই সময় তিনি রাজত্ব করতেন মিশরের বুকে। খুফুকেই পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য গিজার গ্রেট পিরামিডের নির্মাণকর্তা বলে মনে করা হয়।'

এর পর তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন একটু দূরে রাখা এক আবক্ষ

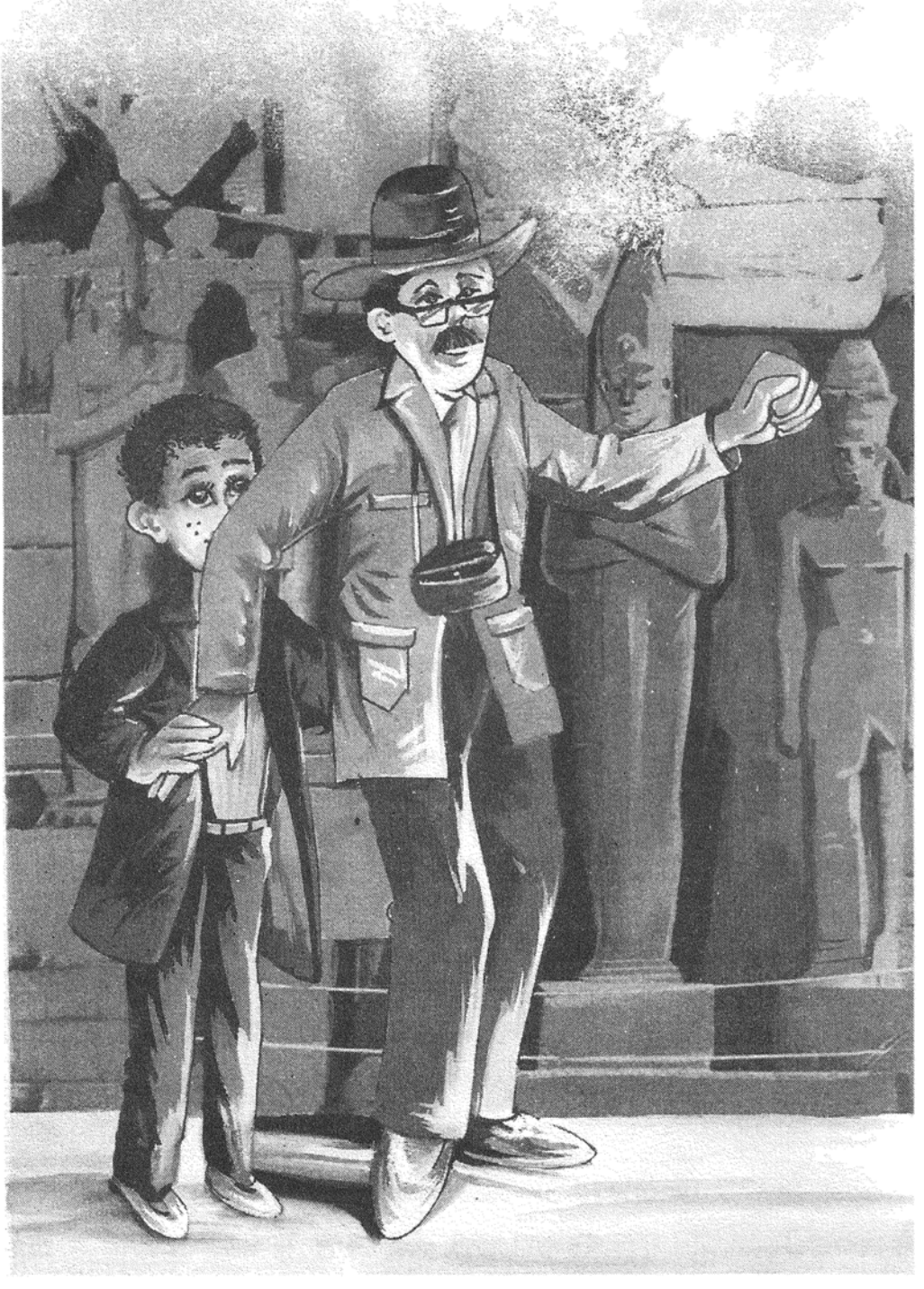

মূর্তির সামনে। তার অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেলেও সেটা যে নারীমূর্তি ছিল তা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। ডা. নাসের বললেন, 'মনে করা হয়, এটা মিশরের বিখ্যাত রানি ক্লিওপেট্রার মূর্তি। যুগ যুগ ধরে যাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক গল্প-কাহিনি, যদিও তার মধ্যে প্রমাণের বদলে অনুমান বা কল্পনার পরিমাণই বেশি।'

একের পর এক তিনি আমাদের দেখাতে লাগলেন নানা মূর্তি। তার কোনোটা আমেনহোটেপের, কোনোটা দ্বিতীয় রামেসিসের, কোনোটা অন্যান্য ফারাও বা রানিদের, আর তার সঙ্গে বলে যেতে লাগলেন ওঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য। প্রদর্শনীকক্ষে রাখা আছে অনেক মমি। সেগুলোর পাশে রাখা আছে বিরাট বিরাট পাথরের বাক্স। তার গায়ে আবার নানা ধরনের চিত্রলিপি খোদাই করা আছে। ডা. নাসেরের মুখে শুনলাম, এই বিরাট বিরাট পাথরের বাক্সকে বলা হয় 'সারকোফ্যাগাস'। মমির কাঠ বা ধাতুর তৈরি আধার সারকোফ্যাগাসের মধ্যে ভরে রাখা হত, যাতে যুগ যুগ ধরে মমিটাকে অক্ষয় রাখা যায়।

একটা সারকোফ্যাগাসের গায়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ডা. নাসের বললেন, 'ভালোভাবে লক্ষ করুন এই খোদাইকরা ছবিগুলো। এটা মৃত ব্যক্তির অন্তিম যাত্রার বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ছবি। এই দেখুন, প্রথমে ক্রীতদাসের দল মৃত ব্যক্তির জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর যাচ্ছে পেশাদার ক্রন্দনরত রমণীর দল। তারপর চলেছে পুরোহিতের দল স্লেজ গড়িতে কফিন নিয়ে। তারও পর বলদে-টানা স্লেজ গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটা নৌকো। আর সব শেষে চলেছে মৃতের পরিবার-পরিজনেরা। ঠিক এই ভাবেই সেই সময় শেষ যাত্রা করা হত। এ জাতীয় অনেক ছবি নানা জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।'

আমি ডা. নাসেরকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, শবযাত্রায় নৌকো কেন? এখানে আরও বেশ কয়েকটা অন্য ছবিতে নৌকো লক্ষ করলাম। তা ছাড়া এই সংগ্রহশালাতেও দেখলাম বেশ কয়েকটা নৌকো রাখা আছে। এর কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?'

ডা. নাসের বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। প্রাচীন মিশরবাসীরা মনে করতেন যে, আত্মার মৃত্যু হয় না। ঘুমন্ত দেহ থেকে আত্মা অন্য এক জগতের

BanglaBook.org

দিকে যাত্রা করে। সেখানে যেতে হয় নদী পার হয়ে। তাই প্রত্যেক সমাধিস্থানে একটা করে সোলার বার্জ বা একটা করে নৌকো রেখে দেওয়া হত। এই মিউজিয়ামে যেসব নৌকো সংরক্ষিত আছে, সেগুলো সবই বিভিন্ন সমাধিস্থানে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির ক্ষমতা বা পদমর্যাদা অনুযায়ী সমাধিস্থানে রাখা হত কাঠ, রুপো বা সোনার তৈরি নৌকো।'

ডা. নাসেরের কথা শুনে ডা. ঘটক তাঁকে বললেন, 'আমাদের শাস্ত্রেও মৃত্যুর পর নদী পার হওয়ার একটা ব্যাপার আছে। সে নদীর নাম বৈতরণী। পবিত্র ষাঁড়ের লেজ ধরে সে নদী পার হতে হয়।'

ডা. ঘটকের কথা শেষ হতেই ডা. নাসের বললেন, 'আপনাদের শাস্ত্রের সঙ্গে প্রাচীন মিশরের রীতিনীতির বেশ মিল ছিল দেখছি! শুধু নদী পার হওয়ার ব্যাপারটা নয়, প্রাচীন মিশরীয়রা ষাঁড়কে খুব পবিত্র প্রাণী মনে করত। তাদের পুজো করত। এমনকী মৃত্যুর পর তাদেরও মমি তৈরি করে ঘটা করে সমাধি দেওয়া হত। বেশ কয়েকটি অতি প্রাচীন সাক্কারাকাফ্যাগাসে ষাঁড়ের মমি পাওয়া গিয়েছে।'

এর পর আমরা দেখলাম সেই রোসেটা স্টোনের প্রতিলিপি। একতলায় মিউজিয়ামের প্রধান দেখার জিনিসগুলো দেখে এবং কিছু ছবি তুলে আমরা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চললাম। দোতলায় রয়েছে বালক রাজা তুতানখামেনের গ্যালারি। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে আমার হঠাৎ মনে পড়ল, তুতানখামেনের অভিশাপের সেই মিথের কথা। আমি ডা. নাসেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুতানখামেনের অভিশাপের ব্যাপারে আপনি কী বলেন?'

ডা. নাসের বললেন, 'মিশরবাসীরা মনে করতেন, কফিনের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় অনন্তলোকে যাত্রার প্রতীক্ষা করতেন ফারাওরা। তুতানখামেনের সমাধি যেখানে রাখা ছিল তার প্রবেশদ্বারের মাথায় একটা পাথরের ফলকে হাইয়ারোগ্লিফিক ভাষায় কয়েকটা কথা লেখা ছিল। মোটামুটি তার মূল কথা হল, রাজা এখানে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন, তাঁকে বিরক্ত কোরো না। আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে তিনি তোমাকে অভিশাপ দেবেন। এই ফলক এবং যারা তুতানখামেনের সমাধিস্থানে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন, তাঁদের পরবর্তীকালে অস্বাভাবিক মৃত্যু তুতানখামেনের অভিশাপের ব্যাপারে মানুষের মনে একটা বিশ্বাসের জন্ম দেয়।'

BanglaBook.org

ডা. ঘটক এবার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি নিজে কি বিশ্বাস করেন অভিশাপের ব্যাপারটা?'

প্রশ্নটা শুনে গ্যালারিতে ঢোকার মুখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন ডা. নাসের। কয়েক মুহূর্ত যেন নিজের মনে কী একটা চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি না করি তাতে কিছু যায়-আসে না। তবে এখানকার অধিকাংশ মানুষ কিন্তু এসব ব্যাপার খুব বিশ্বাস করেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন।'

আমরা ঢুকলাম তুতানখামেনের গ্যালারিতে। বিশাল গ্যালারিতে রয়েছে তাঁর সমাধি থেকে পাওয়া কয়েক হাজার প্রত্নবস্তু। ডা. নাসেরের মুখ থেকে শুনলাম, সমাধিচোরের দল ফারাও খুফুসহ অন্যান্য রাজার সমাধির যাবতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করলেও তুতানখামেনের সমাধির সারকোফ্যাগাস অর্থাৎ কফিন রাখার আধারসহ সমস্ত জিনিসই কিন্তু অবিকৃত অবস্থায় ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, কুসংস্কারের জন্যে তারা তুতানখামেনের সমাধিতে হাত দেয়নি অথবা তারা এই সমাধির সন্ধান পায়নি। তুতানখামেনের সমাধি খুঁজে বের করতে ইংরেজ প্রত্নবিদ হাওয়ার্ড কার্টারের সময় লেগেছিল দীর্ঘ ছ-বছর। সামান্য প্রমাণ সম্বল করে খড়ের গাদায় সুচ খুঁজতে নেমেছিলেন কার্টার এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হন। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম গ্যালারি। দেখলাম, অংশুর চোখে-মুখে ঝরে পড়ছে বিস্ময়। সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সে।

ডা. নাসেরের কাছ থেকে আরও জানলাম, তুতানখামেনের পিতা ছিলেন ফারাও এখেনাতেন। তাঁর নাবালিকা রানি আমেনাতেনের গর্ভে জন্ম হয় তুতানখামেনের। এই ফারাও এখেনাতেনের আর এক রানি ছিলেন নেফারতিতি। গ্যালারিতে সাজানো আছে বালক রাজার সোনার সিংহাসন, তাঁর ব্যবহৃত সোনা, রুপো, পাথরের তৈরি নানা জিনিসপত্র। তবে সবচেয়ে আকর্ষক সোনা ও বহুমূল্য পাথর দিয়ে তৈরি তুতানখামেনের মুখোশ ও তাঁর কফিন। পরপর চারটে অলংকৃত কাঠের বাক্সর মধ্যে একটা পাথরের সারকোফ্যাগাস, তার মধ্যে আবার পরপর তিনটে সোনার কফিন, তার মধ্যে শায়িত ছিল বালক রাজার দেহ। পণ্ডিতদের অনুমান, দশ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসেন। বারো বছর বয়সে এক বালিকাকে তিনি বিয়ে করেন ও

BanglaBook.org

মাত্র আঠারো বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার ফোটো তোলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই গ্যালারিতে ফোটো তোলা নিষেধ। কারণ, ফ্ল্যাশের ঝলকানিতে হাজার বছরের প্রাচীন চিত্রলিপির ক্ষতির আশঙ্কা আছে। ডা. নাসের আমাদের উদ্দেশে বললেন, 'জানেন তো, আধুনিক গবেষকদের অনুমান, মিশরের এই বালক রাজাকে হত্যা করা হয়েছিল। তুতানখামেনের খুলিতে একটা দাগ পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত মাথায় আঘাত করে তাঁকে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া কয়েকটা হাইয়ারোগ্লিফিকেও এর ইঙ্গিত মিলেছে। তবে অধুনা মৃত্যুর আরও অন্য কারণের কথাও বলা হচ্ছে।'

তুতানখামেনের গ্যালারিতে প্রায় এক ঘন্টা সময় কেটে গেল। হঠাৎ ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। ডা. নাসের বললেন, 'এবার নীচে নামতে হবে। মিউজিয়াম বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। মমির গ্যালারিটা দেখা কিন্তু বাকি রয়ে গেল।'

একতলায় নেমে এলাম আমরা। তারপর যখন মিউজিয়ামের লম্বা হলঘর পেরিয়ে বাইরে পা রাখতে যাব, ঠিক তখন ডা. ঘাঁক বললেন, 'অংশু কোথায় গেল?'

সত্যিই তো! অংশু আমাদের সঙ্গে নেই। কিন্তু এই একটু আগেই তো সিঁড়ি দিয়ে আমার পাশে পাশে নীচে নামল! তাহলে সে গেল কোথায়? অংশুকে খোঁজার জন্য আমরা আবার পিছনে ফিরলাম। একতলার বিরাট হলঘরের কোথাও তাকে পাওয়া গেল না প্রথমে। তারপর আমরা দোতলায় উঠবার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম তাকে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার মুখে সে আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে, এক কোনায় আধো অন্ধকারে টেবিলের উপর রাখা একটা কাচের বাক্স দেখছে। ডা. নাসের আমাদের ইশারায় চুপ করতে বলে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমিও গেলাম। দেখলাম, কাচের বাক্সটার গায়ে প্রায় মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অংশু। বাক্সটার মধ্যে রাখা আছে পাথরের লম্বা ফুলদানির মতো দেখতে মুখবন্ধ কয়েকটা পাত্র। কয়েক সেকেন্ড সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর বুঝতে পারলাম, ভিতরের জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে অংশু যেন বিড়বিড় করে কী বলছে! তার মধ্যে একটা শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, 'জেসের-জেসেরু'। ডা.

BanglaBook.org

নাসের এর পর সম্ভবত অংশু কী বলছে তা ভালো করে শোনার জন্য আর এক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাচের বাক্সর গায়ে তাঁর ছায়া পড়তেই চমকে পিছন ফিরে তাকাল অংশু। তার মুখে ফুটে উঠল অপ্রস্তুত ভাব। ডা. নাসের তার কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি জেসের-জেসেরু কাকে বলে জানো?'

অংশু বলল, 'না।'

ডা. নাসের বললেন, 'তাহলে তুমি এইমাত্র কথাটা বলছিলে কেন? কথাটা তুমি কোথায় শুনলে?'

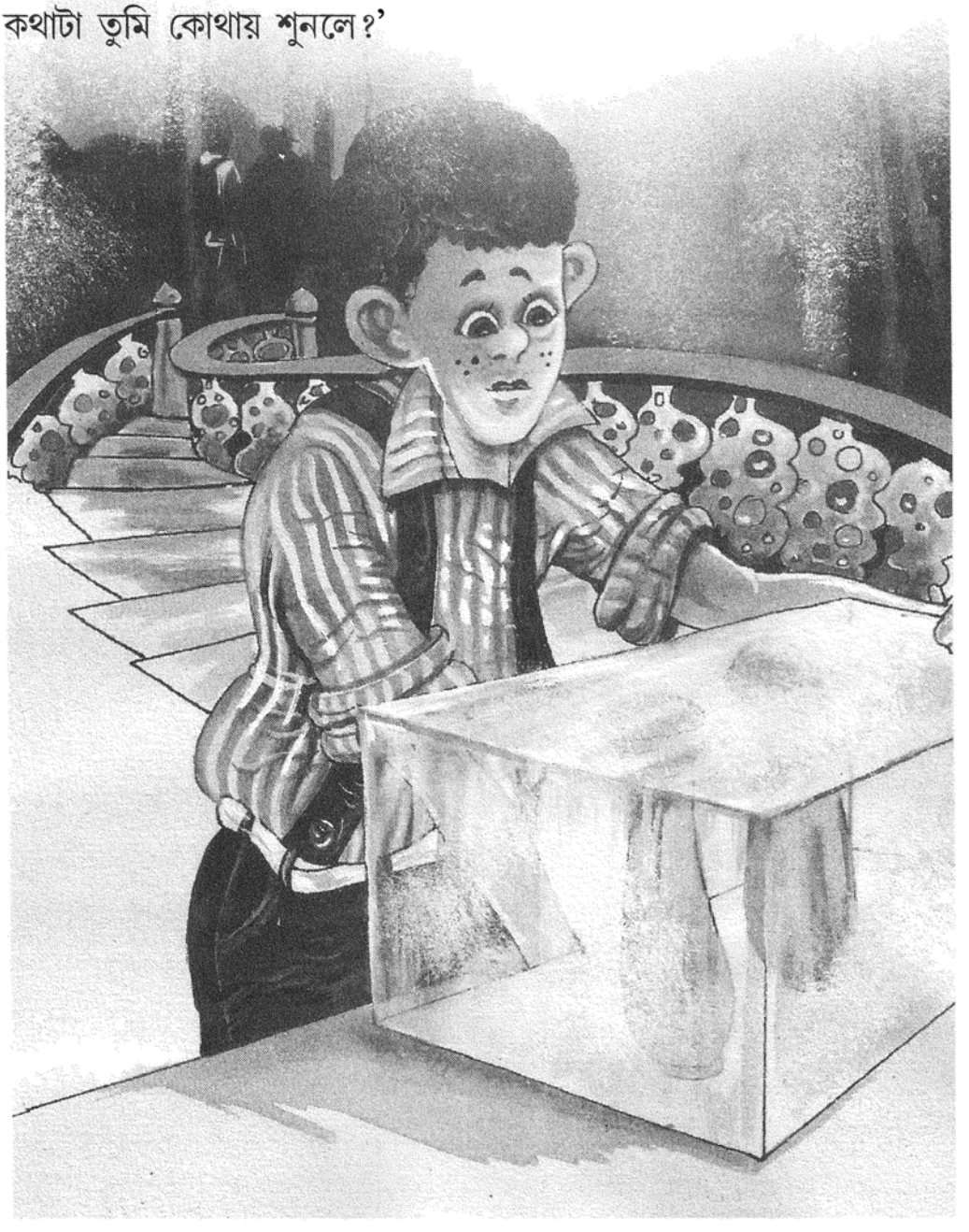

অংশু কোনো উত্তর দিল না। যেন ডা. নাসেরের কথা সে বুঝতেই পারল না। সে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। আমি একবার তাকালাম বাক্সটার দিকে। তার গায়ে কোনো কিছু লেখা নেই। মনে হয় সদ্য তৈরি করা হয়েছে বাক্সটা। তার কাঠের ফ্রেমের গা থেকে এখনও বার্নিশের মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। সম্ভবত বাক্সটা সাময়িকভাবে সেখানে রাখা হয়েছে। পরে মিউজিয়ামের অন্য কোথাও ভালো করে রাখা হবে। ডা. নাসের আর অংশুকে কোনো প্রশ্ন করলেন না। ঢং করে মিউজিয়াম বন্ধ হওয়ার শেষ ঘণ্টা বাজল। আর আমরাও বাইরে বেরিয়ে চেপে বসলাম গাড়িতে। কায়রো শহরের রাস্তা, দোকানপাট তখন ঝলমলে আলোর মেলায় সেজে উঠেছে। সেসব দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম হোটেলে।

গাড়ি থেকে আমাদের সঙ্গে ডা. নাসেরও নামলেন। গাড়ি চালাতে চালাতে তিনি যেন গভীরভাবে কী চিন্তা করছিলেন। নিজে থেকে একটা কথাও বলেননি। আমরা যখন হোটেলে ঢুকতে যাচ্ছি, তখন হোটেলের কাচের দরজা ঠেলে বাইরে বের হল মাঝারি উচ্চতার বেশ মোটা একটা লোক। কালো রঙের সুট পরা, মাথার চুল খুব ছোটো ছোটো করে ছাঁটা। তাঁর এক কানে আবার একটা বড়ো সোনার মাকড়ি। আমি ছিলাম সকলের প্রথমে। আমার পিছনে ছিল অংশু, আর তার পিছনে ডা. ঘটক ও ডা. নাসের। আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। তারপর বলে উঠল, 'আরে ডাক্তার নাসের যে! তা হঠাৎ এখানে কী মনে করে? আজকাল হোটেলে থাকছেন নাকি?' কথাগুলো সে ইংরেজিতে বলল।

তার কথা শুনে আমি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম, ডা. নাসেরও দাঁড়িয়ে পড়েছেন লোকটিকে দেখে। ডা. নাসের খুব রুক্ষ স্বরেই এবার লোকটির কথার উত্তর দিলেন, 'আমি কোথায় থাকছি না থাকছি তা জেনে তোমার দরকার কী?'

লোকটি আকর্ণ বিস্তৃত হাসি ছড়িয়ে বলল, 'জেনে রাখা ভালো, আপনি তো আবার অনেক কিছুর খোঁজখবর রাখেন! এখানে-ওখানে যাওয়া-আসা করেন। নতুন কিছুর সন্ধান পেলে বলবেন, ভালো দাম পাবেন।'

ডা. নাসের কোনো জবাব দিলেন না। দেখলাম, তাঁর চোখ-মুখ

BanglaBook.org

রাগে লাল হয়ে গিয়েছে। লোকটা কিন্তু তখনও হাসছে। লোকটির দাঁতগুলো সোনা দিয়ে বাঁধানো। হাসি শেষ করে সে গিয়ে উঠে বসল আমাদের গাড়ির ঠিক পাশেই রাখা একটা ছাই রঙের কন্টেসায়। গাড়িটা তাকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল হোটেল ছেড়ে। সেদিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ডা. নাসের বললেন, 'স্কাউন্ড্রেল।'

লিফটে উঠতে উঠতে ডা. ঘটক জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটি কে?'

ডা. নাসের বললেন, 'ওর নাম আলতুনিয়া। একেবার পাকা শয়তান। কায়রোয় একটা সুভেনিরের দোকান আছে ওর। কিন্তু সেটা হল একটা লোক-দেখানো ব্যাবসা। ওর আসল কারবার হল প্রাচীন দুঃস্প্রাপ্য জিনিসপত্র বিদেশে পাচার করা। এই লোকদের জন্য কত দুর্মূল্য জিনিস যে এদেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এসব ব্যাপারে বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছিল আলতুনিয়া। কিন্তু প্রত্যেকবারই টাকার জোরে আর প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে গিয়েছে। ওর ধারণা, আমার কাছে কিছু অতি মূল্যবান হাইয়ারোগ্লিফিক আছে। তাই সেগুলো হাতাবার জন্য কিছুদিন হল ও আমার পিছনে লেগে আছে।' এর পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডা. নাসের বললেন, 'তবে ওর একটা গুণ সকলেই স্বীকার করে। ওর মতো ভালো হাইয়ারোগ্লিফিক পড়তে খুব অল্প লোকই পারে।'

BanglaBook.org

উপরে ওঠার পর আরও মিনিট দশেক আমাদের সঙ্গ দিলেন ডা. নাসের। তার মধ্যে তিনি ডা. ঘটকের সঙ্গে সেরে ফেললেন কিছু কাজের কথা। ঠিক হল, আগামী কাল সকাল দশটা নাগাদ তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন গিজায় পিরামিড ও স্ফিংক্স দেখাতে। ফিরে এসে তিনি আমাদের সঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজন সারবেন। তারপর ডা. ঘটকের সঙ্গে কিছু কাজের কথা আলোচনা করতে বসবেন। কাজের কথা বলতে যে অংশুর ব্যাপার, তা বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। অংশু সোফায় বসে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। ডা. নাসের উঠবার সময় তাকে বললেন, 'আজ তাহলে আমি যাই বন্ধু!। কাল তোমাকে আমি মজার একটা খেলা দেখাব।'

অংশু হেসে বলল, 'আচ্ছা!'

৩

সকাল বেলা একটু দেরি করেই ঘুম ভাঙল আমার। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে। আসলে অনেক রাত পর্যন্ত 'দ্য আইজ অব দি স্ফিংক্স' বইটা আমি পড়ে শেষ করে, রাত দুটো নাগাদ ঘরের বাতি নিভিয়েছি। তা ছাড়া আসবার সময় প্লেনেও আমি ঘুমোইনি। তাই সকালে আমার উঠতে দেরি হয়ে গেল। অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছিলেন ডা. ঘটক আর অংশু। আমি ঘরের বাইরে আসতেই ডা. ঘটক বললেন, 'বেশ ভালোই একটা ঘুম দিলে দেখছি! তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও, আমি ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিচ্ছি।'

আমার বেশ লজ্জা করল তাঁর কথা শুনে। সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে অথচ আমার জন্য তাঁর আর অংশুর ব্রেকফাস্ট করা হয়নি এখনও! অংশুর হয়তো খিদে পেয়েছে। তাকে দেখলাম খাবার টেবিলে বসে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ব্রাশ করে মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে বসলাম আমি। ততক্ষণে ইন্টারকমে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে ডা. ঘটকও টেবিলে এসে বসেছেন। আমি তাঁর পাশে বসবার পর তিনি বললেন, 'জানো তো সৌরভ, ভোররাতে আমি একটা খুব মজার স্বপ্ন দেখেছি! দেখলাম, একটা বিরাট বড়ো পিরামিডের একদম মাথায় চড়ে বসেছি আমি। সেখান থেকে নীচে নামার চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই নীচে নামতে পারছি না। শুধু চিৎকার করছি, আমাকে নীচে নামিয়ে দাও, নীচে নামিয়ে দাও বলে। শেষে চিৎকার শুনে আমার পাশে আবির্ভূত হলেন একজন ফারাও। ঠিক যেমন ফারাওয়ের বেশ কয়েকটা ফটো কাল আমি মিউজিয়ামে দেখেছি। তিনি আমাকে বললেন, নামতে হলে উপর থেকে নীচে লাফ দাও। আমি বললাম, এত উঁচু থেকে নীচে লাফ দেব কী করে! তিনি তখন বললেন, তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরো, আমি তোমাকে নীচে নামিয়ে দেব। তাঁর কথা শুনে আমি তাঁকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। আর তিনি আমাকে নিয়ে লাফ দিলেন নীচে। তাঁকে নিয়ে আমি আছড়ে পড়লাম নীচে। সঙ্গেসঙ্গে ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। ঘুম ভেঙে আমি কী দেখি জানো? দেখি, খাট থেকে নীচে পড়ে গিয়েছি! আর যাকে আমি ফারাও ভেবে জড়িয়ে ধরেছিলাম, সেটা আসলে একটা পাশবালিশ!'

BanglaBook.org

ডা. ঘটকের কথা শুনে আমি আর অংশু হো হো করে হাসতে লাগলাম। ডা. ঘটক নিজেও যোগ দিলেন তাতে। একটু পরেই ব্রেকফাস্ট এসে গেল। ব্রেকফাস্ট সারার পর আমরা স্নানের জন্য তৈরি হলাম।

ঠিক দশটায় নীচের রিসেপশন থেকে ফোন এল, ডা. নাসের এসেছেন। আমরা তিন জন তৈরি হয়েছিলাম। ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে গেলাম। কিন্তু রিসেপশনে তো তিনি নেই! একটা ঢিলেঢালা পোশাকপরা মাথায় পাগড়িবাঁধা লোক কথা বলছে রিসেপশন কাউন্টারে বসে-থাকা আল মামুনের সঙ্গে। লোকটি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের পায়ের শব্দ শুনে লোকটি ফিরে তাকাতেই আমরা চমকে উঠলাম। আরে, ইনি তো ডা. নাসের! পিছন থেকে তাঁকে এ পোশাকে চিনতেই পারিনি। ডা. নাসের মনে হয় বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। তাই তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, 'এ পোশাকের নাম ব্যালিবিয়া, স্থানীয় পোশাক, খুব আরামদায়ক। আমাকে অবশ্য পেশার কারণে অধিকাংশ সময় কোট-প্যান্টই পরতে হয়।'

হোটেল ছেড়ে আমরা রওনা দিলাম গিজার দিকে। গল্প করতে করতে আমরা একসময় নীলনদের ব্রিজ পেরিয়ে হাজির হলাম শহরের শেষ প্রান্তে। আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছে দু-পাশের দৃশ্যপট। আরও কিছুক্ষণ চলার পর ডা. নাসের হঠাৎ বললেন, 'ওই যে, দেখতে পাচ্ছেন?'

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, দূরে আকাশের বুকে দেখা যাচ্ছে পিরামিডের চুড়ো! প্রথমে একটা, তারপর আস্তে আস্তে আরও দুটো চোখে পড়ল। আমরা এসে হাজির হলাম পিরামিড চত্বরে। ঊষর প্রান্তরে গর্বিত ভঙ্গিতে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম 'গ্রেট পিরামিড'।

গাড়ি থেকে নামতেই একদল লোক দৌড়ে এল আমাদের কাছে। তাদের কেউ ব্যালিবিয়া বিক্রেতা, কেউ সুভেনির বিক্রেতা, কেউ বা আবার উটের মালিক। পর্যটকদের মধ্যে অনেককেই দেখলাম উটের পিঠে চেপে পিরামিড চত্বরে ঘুরে বেড়াতে। যে লোকগুলো আমাদের কাছে এসেছিল ডা. নাসের আরবিতে তাদের উদ্দেশ্যে কী একটা বলতেই তারা দূরে চলে গেল। হাঁটতে হাঁটতে আমরা দাঁড়ালাম গ্রেট পিরামিডের সামনে।

ডা. নাসের বললেন, 'এই গ্রেট পিরামিডের নির্মাতা মিশরের

BanglaBook.org

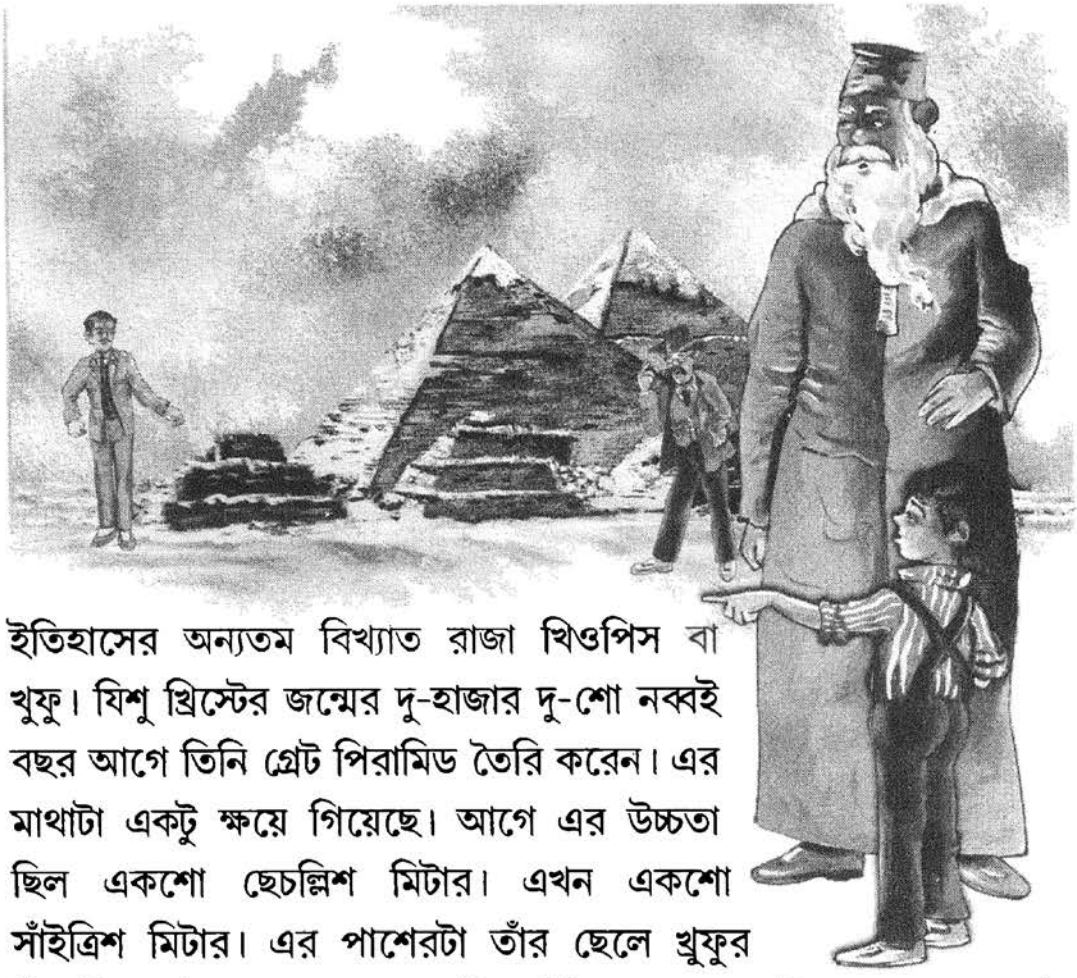

ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত রাজা খিওপিস বা খুফু। যিশু খ্রিস্টের জন্মের দু-হাজার দু-শো নব্বই বছর আগে তিনি গ্রেট পিরামিড তৈরি করেন। এর মাথাটা একটু ক্ষয়ে গিয়েছে। আগে এর উচ্চতা ছিল একশো ছেচল্লিশ মিটার। এখন একশো সাঁইত্রিশ মিটার। এর পাশেরটা তাঁর ছেলে খ্রুফুর পিরামিড। উচ্চতা একশো ছত্রিশ মিটার। আর ওই যে দূরে ছোটো পিরামিডটা দাঁড়িয়ে, সেটা নাতি মেনকুরুর পিরামিড।'

আমরা প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নীচে নেমে ঢুকলাম গ্রেট পিরামিডের সেই কক্ষে, যেখানে একসময় শায়িত ছিলেন ফারাও খুফুর মরদেহ। কিন্তু সেখানে এখন কিছু নেই। শুধু আছে মিশরের পুরাতত্ত্ব বিভাগের একটা বোর্ড। তাতে এই পিরামিড বা ফারাও খুফুর সম্পর্কে গুটিকয় কথা লেখা। ডা. নাসেরের মুখে শুনলাম, এই তিনটি পিরামিডের সব কিছু অনেক আগেই সমাধিচোরের দল হাতিয়ে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে অতি সামান্য যা কিছু উদ্ধার হয়, তা কায়রো মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

গ্রেট পিরামিড দেখার পর আমরা একে একে দেখলাম, অন্য দুটো পিরামিডও। তবে সবচেয়ে ভালো লাগল মেনকুরুর পিরামিড। এই পিরামিডে ঢোকার পথ অদ্ভুত। মাটি থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে পিরামিডের গায়ে সুড়ঙ্গের প্রবেশপথ। লোকজনকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা

BanglaBook.org

করা হয়েছিল। বেশ একটা রোমাঞ্চ হচ্ছিল সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে মেনকুরুর পিরামিডের নীচে নামতে।

এসব দেখতে আমাদের ঘন্টাখানেক সময় কেটে গেল। সব শেষে আমরা এসে দাঁড়ালাম স্ফিংক্সের সামনে। বালুকাময় প্রান্তরে যুগ যুগ ধরে এই তিনটি পিরামিডকে পাহারা দিয়ে চলেছে মানুষের মুখ আর সিংহের দেহধারী এই স্ফিংক্স। নীল নদের তীরে এই প্রাচীন সভ্যতার দেশে অনেক কিছু গড়ে উঠেছে। ধ্বংস হয়েছে তার চোখের সামনে। বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সাক্ষী সে। কতবার বইয়ের পাতায় দেখেছি তার ফটো! তার সামনে এসে আমি কোনোদিন দাঁড়াতে পারব, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! আবেগ কাটিয়ে ওঠার পর আমি বেশ কয়েকটা ফোটো তুললাম তার।

ডা. নাসের বললেন, 'একসময় এর নাম ছিল, হোর-এম-আখেট অর্থাৎ দিগন্তে অবস্থিত হোরাস। হোরাস এক দেবতার নাম। আর আরবি ভাষায় একে বলা হয় আবু-এল-হোল, যার মানে হল, ত্রাসের পিতা।'

অংশু অবাক হয়ে দেখছিল বিশাল এই মূর্তিটাকে। হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, ওর নাকটা ভাঙা কেন?'

প্রশ্নটা আমার মনেও এসেছিল। উত্তরটা শোনার জন্য আমিও তাকালাম ডা. নাসেরের দিকে। তিনি বললেন, 'আসলে কয়েক হাজার বছর ধরে ও একভাবে এখানে বসে পাহারা দিয়ে চলেছে মিশরের সভ্যতাকে। সেই প্রাচীনকাল থেকে ওর উপর দিয়ে বয়ে চলেছে মরুঝড়। তা ছাড়া রোদ-বৃষ্টি ইত্যাদি তো আছেই। এসব কারণে ওর নাকসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আর একসময় স্ফিংক্সের নাক লক্ষ করে গুলি ছুড়ে নিশানা পরীক্ষা করত বন্দুকবাজরা।'

ডা. নাসেরের কথা শুনে অংশু বলল, 'এখন করে না?'

ডা. নাসের হেসে বললেন, 'না, এখন আর কেউ তা করে না। কেউ করলে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

দানিকেনের বইটায় পড়ছিলাম বিশাল এই স্ফিংক্সের উচ্চতা বাইশ মিটার, দৈর্ঘ্য আশি মিটার। আলেকজান্ডার, নেপোলিয়নের মতো মহাবীরেরা একদিন এসে দাঁড়িয়েছিলেন এই মূর্তির পদতলে। শ্রদ্ধায় মাথা নত করে ছিলেন এর সামনে।

BanglaBook.org

ডা. ঘটকের মধ্যে এমনিতে আবেগের বহিঃপ্রকাশ কম। তিনি দেখলাম, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ডা. নাসেরের হাত জড়িয়ে ধরে আবেগঘন কণ্ঠে বললেন, 'আজ আপনি আমাকে যা দেখালেন তার কোনো তুলনা নেই! যদি মিশরের আর কিছু দেখা না-ও হয়, তাহলেও আমার কোনো আপশোস থাকবে না।'

ডা. নাসেরের কাছ থেকে এর পর বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে লিখে নিলাম পকেট ডায়েরিতে। পিরামিড চত্বরের ফুটপাথে অনেক সুভেনিরের দোকান। আমি একটা দোকান থেকে ইঞ্চি ছয়েকের একটা বেলে পাথরের স্ফিংক্সের মূর্তি কিনলাম। দাম নিল দশ ইজিপ্সিয়ান পাউন্ড। এক ইজিপ্সিয়ান পাউন্ডের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় সাত টাকা। এর পর আমরা ফেরার জন্য গাড়িতে উঠলাম। বেলা দেড়টা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের হোটেলে।

হোটেলে পৌঁছে আমরা একসঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করলাম। একটা জিনিস লক্ষ করলাম, আগের দিন দুপুরে যে নিরামিষ তরকারি আমরা খেয়েছিলাম, সেটা কিন্তু প্রতিবারই খাবার সময় দেওয়া হচ্ছে। জিনিসটা কী, তা ডা. নাসেরকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, 'এর নাম মোলোখিয়া। মিশরীয়দের খুব প্রিয় খাবার। মোলোখিয়ার পাতা খুব রসালো আর সুস্বাদু হয়। মিশরে প্রচুর পরিমাণে এর চাষ হয় এবং এর জন্য অন্য চাষও মার খায়। মিশর সরকার অনেকবার এর চাষ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা সম্ভব হয়নি।'

খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধোওয়ার পর ডা. নাসের অংশুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল আমি তোমাকে যে খেলা দেখাব বলেছিলাম, সেটা কিন্তু আমি ভুলিনি। আমি একটু পরেই তোমাকে সে খেলা দেখাব। তার আগে আমি খেলা দেখাবার জিনিসগুলো সংগ্রহ করি।'

অংশু প্রশ্ন করল, 'কী জিনিস?'

ডা. নাসের বললেন, 'আর দু-মিনিট অপেক্ষা করো। তাহলেই সব দেখতে পাবে।' ডা. নাসের ইন্টারকমে রিসেপশনে কী যেন বললেন।

এর মিনিট দু-এক পরেই ডোরবেলের শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখলাম, হোটেলের একজন একগাদা ছুরি আর কাঁটাচামচ নিয়ে এসেছে। ডা.

BanglaBook.org

নাসেরের কথামতো লোকটার কাছ থেকে সেগুলো নিয়ে নিলাম। হোটেলের লোকটা টেবিলের উপর থেকে আমাদের খাবারের প্লেট নিয়ে চলে যাওয়ার পর ডা. নাসের সেই ছুরি-কাঁটাচামচগুলোকে গোল করে সাজালেন টেবিলের উপর। তাঁর কথামতো চেয়ারগুলো টেবিলের পাশ থেকে সরিয়ে রেখে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা তিন জন। ডা. নাসের অংশুর দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন। তারপর টেবিল থেকে দুটো ফোটো তুলে নিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিলেন। সে দুটো উপরে ওঠার পর তাঁর হাত পর্যন্ত নামতে যতটা সময় নিল তার মধ্যেই তিনি টেবিল থেকে দুটো কাঁটাচামচ তুলে নিয়ে সে দুটোকেও শূন্যে ছুড়ে দিলেন। এর পর তাঁর হাতের অদ্ভুত কৌশলে ছুরি-কাঁটাচামচগুলো শূন্যে লাফালাফি করতে লাগল। আমরা অবাক হয়ে দেখছি তাঁর জাগলিং। এর পর আরও দুটো, তারপর আরও দুটো, এইভাবে আরও বাড়তে লাগল শূন্যে লাফালাফি করা ছুরি আর কাঁটাচামচের সংখ্যা। একসময় সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল টেবিল। সব ছুরি-কাঁটাচামচই শূন্যে ভাসতে লাগল। মিনিট দশেক পর খেলা শেষ করলেন ডা. নাসের। খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই আমরা হাততালি দিয়ে উঠলাম।

ডা. ঘটক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এই খেলা শিখলেন কোথায়?'

তিনি বললেন, 'অনেক বছর আগে আবুসিম্বলে একটা গবেষণার কাজে বেদুইনদের তাঁবুতে মাস ছয়েক কাটাতে হয় আমাকে। তখন তাদের কাছ থেকেই শিখি।'

অংশু এতক্ষণ চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে ছিল ডা. নাসেরের দিকে। সে হঠাৎ বলল, 'আর কী খেলা জানেন আপনি?'

ডা. নাসের বললেন, 'জানি নয়, জানতাম। একসময় আমি খুব ভালো বন্দুক ছুড়তে পারতাম। তবে সে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। আমরা বন্ধুরা মিলে দলবেঁধে মরুভূমিতে হুবার পাখি শিকার করতে যেতাম।'

অংশু আবার গোল গোল চোখে প্রশ্ন করল, 'আপনিও কি তাহলে স্ফিংক্সের নাক লক্ষ করে বন্দুক ছুড়েছেন?'

ডা. নাসের বললেন, 'হ্যাঁ, ছুড়েছি তো! তখন ওটাই তো ছিল আমাদের লক্ষ্যভেদের জায়গা। তখন কায়রোয় এত লোকজন, দোকানপাট

BanglaBook.org

কিছুই ছিল না। এত ট্যুরিস্টও আসত না এখানে। গিজার চারদিক প্রায় সবসময় ফাঁকা থাকত। কায়রোর তামাম বন্দুকবাজের দল জমায়েত হত সেখানে তাদের নিশানা পরীক্ষার জন্য। আমিও যেতাম সেখানে। ওখানেই একবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যায় এই খেলাকে কেন্দ্র করে। আর তার পরেই বন্দুক ছোড়া বন্ধ করে দিলাম আমি। অবশ্য বাবার আমলের সেই ইংলিশ রিপিটার রাইফেলটা এখনও আমার ঘরের কোনায় ধুলোমাখা অবস্থায় পড়ে আছে।'

আমি একবার ভাবলাম ডা. নাসেরকে জিজ্ঞেস করি যে, অ্যাক্সিডেন্টটা কী ঘটেছিল? যে কারণে তাঁকে বন্দুক ছোড়া ছেড়ে দিতে হল! কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, প্রশ্নটা হয়তো একান্তই ব্যক্তিগত হয়ে যাবে। তাই আর জিজ্ঞেস করলাম না।

ডা. নাসের এবার ডা. ঘটককে বললেন, 'আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনার সঙ্গে সেই বিশেষ ব্যাপারে আলোচনা করব আজ। কিন্তু তার আগে আমার একবার কায়রো মিউজিয়ামে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। একটা জরুরি কথা মিউজিয়ামে কিউরেটরের কাছ থেকে আমাকে জানতে হবে। তারপর সন্ধ্যে বেলা এসে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে বসব। এখন আপাতত আপনারা বিশ্রাম নিন।' এ কথা বলার পর তিনি অংশুকে হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা অংশু, তুমি কি আরবি ভাষা পড়তে বা লিখতে জানো? অথবা আরবি ভাষা বুঝতে পার?'

অংশু প্রশ্নটা শুনে প্রথমে বুঝতে পারল না। সে তাকিয়ে রইল ডা. নাসেরের দিকে। ডা. নাসের এবার একটু অন্যভাবে তাকে প্রশ্নটা করলেন, 'তুমি কী কী ভাষা জানো?'

অংশু বলল, 'ইংরেজি আর বাংলা।'

অংশুর উত্তর শোনার পর ডা. নাসের আর কিছু বললেন না। আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি চলে যাওয়ার পর ডা. ঘটক চলে গেলেন নিজের ঘরে, আর আমি অংশুকে নিয়ে আমার ঘরে চলে এলাম। খাটে শোওয়ার পর অংশু আমাকে বলল, 'জানো তো, কাল রাতে আমি আবার সেটা দেখতে পেয়েছি।'

আমি বললাম, 'কোনটা?'

BanglaBook.org

অংশু বলল, 'ওই যে স্বপ্নটা, আমি অসুখ হলে দেখতে পাই। একটা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আমি, আর কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার সামনে। অন্ধকারের মধ্যে তার জ্বলন্ত চোখ দুটো শুধু দেখতে পাচ্ছি। আমি উঠে বসবার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। কে যেন বেঁধে রেখেছে আমাকে। আমার খুব ভয় করছে।'

আমি অংশুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, 'তুমি ভয় পেয়ো না, তোমার অসুখ ভালো হয়ে যাবে। ডা. ঘটক আর ডা. নাসের ভালো করে দেবেন তোমাকে। তোমার শরীর খারাপ লাগলে তুমি সঙ্গেসঙ্গে বলবে আমাদের। এখন তুমি ঘুমোও।'

অংশু অন্য দিকে পাশ ফিরল আমার কথা শুনে। আমি মনে মনে ঠিক করলাম, অংশুর স্বপ্ন দেখা যে শুরু হয়ে গিয়েছে তা বিকেল বেলায় জানিয়ে দিতে হবে ডা. ঘটককে।

৪

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ডা. নাসের হোটেলে চলে এলেন। তিনি আসার সময় অংশুর জন্য 'কিং কং অ্যালাইভ' নামের একটা সিনেমার সিডি এনেছিলেন। সেটা চালিয়ে দেওয়ার পর অংশু দেখতে বসল। আর আমরা ডা. ঘটকের ঘরে বসলাম আলোচনার জন্য।

ডা. নাসেরই প্রথম মুখ খুললেন। তিনি ডা. ঘটকের উদ্দেশে বললেন, 'যদিও ব্রাসেলসে মেডিক্যাল কনফারেন্সে গিয়ে সারা রাত ধরে অংশুর অসুখ সম্বন্ধে আপনার মুখ থেকে পুরো ব্যাপারটাই শুনেছি এবং অসুস্থ অবস্থায় অংশুর যে কথাবার্তা আপনি ক্যাসেটবন্দি করে আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন, তাও শুনেছি। তবুও আর একবার প্রথম থেকে আমি তা শুনতে চাই। কারণ, আমার বয়স হয়েছে তো! কোনো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমি ভুলে গিয়ে থাকতে পারি। তা ছাড়া শুনতে শুনতে যদি মনের মধ্যে নতুন কোনো প্রশ্ন জাগে, তাহলে আমি তা এখনই জেনে নিতে পারব।'

ডা. নাসেরের কথা শুনে ডা. ঘটক বললেন, 'তাহলে একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। অংশুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় বছর তিনেক আগে। একদিন সন্ধ্যে বেলা আমি আর আমার তরুণ বন্ধু দাবা খেলছিলাম

BanglaBook.org

আমার কলকাতার বাড়ির একতলার চেম্বারে বসে। সকাল থেকেই সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, বিকেলেও তার বিরাম নেই। ফলে অন্য দিনের মতো রোগী দেখার চাপ ছিল না। রাত আটটা নাগাদ সাদা পোশাকপরা এক ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন আমার চেম্বারে। নিজের পরিচয় দিলেন তিনি ফাদার ডিসুজা বলে। কলকাতার একটা অরফান হোম চালান তিনি। তাঁর হোমে একটা ছোটো ছেলে বুকের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। তাই তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে এসেছেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনাদের হোমের নিজস্ব কোনো ডাক্তার নেই? তিনি উত্তর দিলেন, ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন। মাত্র দিন কয়েক আগে মারা গিয়েছেন। অগত্যা খেলা বন্ধ করে আমাকে উঠে পড়তে হল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে আমি চড়ে বসলাম ফাদার ডিসুজার সঙ্গে আনা গাড়িতে।

'আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম অরফ্যান হোমে। গাড়ি থেকে নামার পর ফাদার আমাকে নিয়ে গেলেন রোগীর ঘরে। ঘরটা ছোটো, তাতে সামান্য কিছু আসবাবপত্র আছে। ঘরে ইলেকট্রিক বাল্‌ব ছিল না। টেবিলের উপর শুধু একটা মোমবাতি জ্বলছিল। তার মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ঘরে। সেই আলোয় দেখলাম, এগারো বছর সাতেকের ছোটো ছেলে বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কাছে যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম, ও যেন মাঝে মাঝে কীসব বলছে। কিন্তু কী বলছে তা আমি বুঝতে পারলাম না। সে চোখ বুজে আছে, আর ডান হাত দিয়ে তার বাঁ দিকের বুকের কাছটা খামচে ধরে আছে। দেখে মনে হল, যন্ত্রণাটা বুকেই হচ্ছে।

'আমি প্রথমে তার খাটের পাশে বসলাম। তারপর হার্টবিট পরীক্ষা করার জন্য আমার পোর্টেবল ইকো-কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রটা বের করলাম ব্যাগ থেকে। যন্ত্রটা দেখতে অনেকটা ল্যাপটপের মতো। তাতে একটা এল সি ডি স্ক্রিন বা পরদা আছে। হৃৎস্পন্দনের রেখাচিত্র ফুটে ওঠে সেখানে। যন্ত্রের তারটা ছেলেটির বুকে লাগাতে একটু বেগ পেতে হল আমাকে। কিছুতেই ছেলেটি বুক থেকে হাত সরাতে চাইছিল না। শেষে জোর করে হাতটা সরাতে হল। ছেলেটির সারা শরীর যন্ত্রণায় মোচড় দিচ্ছিল। কোনোরকমে তারটা এয়ার ক্লিপের সাহায্যে লাগালাম। তারটা যাতে সে খুলে ফেলতে না পারে, তার জন্য একটা হাত আমি, আর অন্য হাতটা

BanglaBook.org

ফাদার চেপে ধরে রইলেন। যন্ত্রটা চালু করে দিতেই তাতে ফুটে উঠল তার হৃৎস্পন্দন রেখাচিত্র।

'দেখলাম উল্লম্ব রেখাগুলো তীব্র গতিতে উপর-নীচে ওঠা-নামা করছে। অর্থাৎ তার হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। এই অবস্থায় যে-কোনো মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারে ছেলেটা! কেন এমন হচ্ছে তা ভাবতে গিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ফলে হাতের মুঠিটাও হয়তো আলগা হয়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগে এক ঝটকায় ছেলেটি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বুক থেকে খুলে ফেলল তারটা। তারপর বুকটা আগের মতো খামচে ধরে দুর্বোধ ভাষায় কী একটা বলে উঠে ছটফট করতে করতে কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। শুধু তার শরীরটা মৃদু কাঁপতে থাকল। আমি আবার তাড়াতাড়ি তারটা লাগিয়ে দিলাম তার বুকে। এবার কিন্তু সেটা লাগাতে খুব একটা বেশি বেগ পেতে হল না। তার হাতটা খুব শিথিল বলে মনে হল। যন্ত্রটা চালু হয়ে গেল সঙ্গেসঙ্গেই। কিন্তু পরদায় চোখ পড়তেই আমি দেখতে পেলাম, সেই দ্রুত উপর-নীচ করা উল্লম্ব রেখাগুলো উধাও হয়েছে। তার বদলে পরদা জুড়ে একটা সমান্তরাল সরলরেখা তিরতির করে কাঁপছে। হৃৎস্পন্দন থেমে গিয়েছে ছেলেটার। সম্ভবত হার্টফেল করেছে। আমি ফাদারের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি দুঃখিত, কিছু করতে পারলাম না! ফাদার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চিত যে, ও আর নেই! ওর আগে যখন বুকে ব্যথা হয়েছিল তখনও কিন্তু ও যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এরকম নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। তারপর আবার ধীরে ধীরে ওর চেতনা ফিরে এসেছিল। আমি বললাম, আগে কী হয়েছিল আমি বলতে পারব না। তবে এবার আর ও জেগে উঠবে না।'

ডা. ঘটক একটু জল খেলেন, তারপর ডা. নাসেরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমার আপনার যা পেশা তাতে চোখের সামনে মৃত্যু দেখাটা আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু চোখের সামনে একটা ফুটফুটে ছোটো ছেলের মৃত্যু দেখে মনটা খারাপই লাগছিল। আরও খারাপ লাগছিল কিছু করতে পারলাম না বলে। বেশ কিছুক্ষণ তার খাটের পাশে মাথা নীচু করে বসে রইলাম আমি। হঠাৎ ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে ঘর সংলগ্ন একচিলতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ফাদারও আমার সঙ্গে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন।

BanglaBook.org

বৃষ্টিটা দেখলাম, থেমে গিয়েছে। মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারছে গোল চাঁদ। আজ মনে হয় পূর্ণিমা। ছেলেটির ডেথ সার্টিফিকেট আমাকেই লিখে দিতে হবে। তাই ছেলেটির নাম ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইলাম ফাদারের কাছে। তখনই শুনতে পেলাম, ওর নাম অংশু। বছর তিনেক ধরে আছে ফাদারের অরফ্যান হোমে। ও যখন ফাদারের কাছে এসেছিল তখন ও ছিল বছর চারেকের। ফাদারের কাছে এও জানতে পারলাম, এর আগে ও বারতিনেক এরকমই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমি ফাদারকে জিজ্ঞেস করলুম, ওকে আগে কোনো ভালো ডাক্তার দেখেছিলেন কি না। ফাদার একটু ম্রিয়মাণ হয়ে বললেন যে, ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় আর্থিক কারণে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। সামান্য অনুদানের উপর নির্ভর করে অরফ্যান হোম চালাতে হয় তাঁকে। তা ছাড়া অংশুর অসুস্থতা কখনোই দিন দুয়েকের বেশি স্থায়ী হয়নি।

'যাই হোক, নানা কথাবার্তা বলতে বলতে মিনিট পনেরো কেটে গেল। তারপর আমি এসে বসলাম ছেলেটির খাটের পাশে। যদিও ঘণ্টা তিনেকের আগে নিয়মমতো ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া ঠিক নয়, তবুও ভাবলাম, ওটা ফাদারকে এখনই দিয়ে যাই। কী আর হবে তাতে। প্যাড বের করে লিখে ফেললাম সেটা। সার্টিফিকেটের উপর চোখ বুলিয়ে ফাদারের হাতে যখন সেটা তুলে দিতে যাচ্ছি, তখনই হঠাৎ আমার নজর পড়ল ছেলেটির বুকের দিকে। সার্টিফিকেটটা ফাদারের দিকে বাড়িয়ে দিয়েও আমার হাতটাকে কোলের কাছে গুটিয়ে আনলাম। মনে হল, ছেলেটির বুকের কাছটা যেন ক্ষীণভাবে ওঠানামা করছে। এর পর আমি ধীরে ধীরে ফিরে তাকালাম আমার যন্ত্রের পর্দার দিকে। কারণ, তারটা আমি তখনও ছেলেটার বুক থেকে খুলিনি।

'তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার নিজের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। দেখি, সেই উল্লম্ব রেখাগুলো আবার খেলা করতে শুরু করছে পর্দা জুড়ে। অর্থাৎ ছেলেটির হৃদযন্ত্র আবার চলতে শুরু করেছে। এরকম যে কখনো ঘটে না তা নয়। তবে কোটিতে বা লাখে একটা ঘটে। আরও এক ঘণ্টা পরে যখন আমি ফাদারের সঙ্গে তাঁর অরফ্যান হোম ছেড়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম, তখন ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে বিছানায়। এবং তার হৃৎস্পন্দন তখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ফাদার যখন আমার বাড়ির

BanglaBook.org

সামনে নামিয়ে দিলেন, তখন আমি তাঁকে বলে দিলাম যে, পরদিন আমি নিজেই আবার দেখতে যাব অংশুকে।

'কেন এরকম হল! সারারাত ভাবতে ভাবতে আমার ঘুম এল না। পরদিন সকাল বেলা আমি আবার গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। ফাদার ডিসুজা অফিসঘরে ডেকে আনালেন অংশুকে। দেখলাম, ও প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ। শুধু শরীরটা সামান্য দুর্বল। এ ছাড়া তেমন কিছু লক্ষ করলাম না। ফাদারের সঙ্গে এর পর কিছু সৌজন্যসূচক আলোচনা করে আমি উঠে পড়লাম। আর তার আগে ফাদারকে আমি আমার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে বলে এলাম যে, ভবিষ্যতে যদি অংশু আবার এরকম অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তিনি যেন তৎক্ষণাৎ আমাকে খবর দেন।

'এর পর আমি আবার ডুবে গেলাম দৈনন্দিন কাজের ব্যস্ততায়। ঘটনাটা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। কিন্তু মাস সাতেক পর হঠাৎই একদিন সন্ধ্যে বেলা ফাদারের টেলিফোন পেলাম। আর সেদিনই আমি সচেতনভাবে প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম সেই আশ্চর্য ঘটনা। যন্ত্রণাকাতর অংশুর হৃৎপিণ্ড মিনিট দশেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর হঠাৎই আবার তা নিজে থেকে কাজ শুরু করল।

'অংশুর ব্যাপারটা পেয়ে বসে আমাকে। ঘটনাটা এর পর বারকয়েক প্রত্যক্ষ করলেও এই অসম্ভব ঘটনা কীভাবে ঘটছে তার কোনো সমাধানসূত্র খুঁজে পাইনি আমি। তাই ব্রাসেলসে গল্প করতে করতে আপনাকে বলি ঘটনাটা। যদিও আমার ভয় ছিল যে, ঘটনাটা শোনার পর আপনি আমার মানসিক সুস্থতা সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন।'

এর পর ডা. ঘটক কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ডা. নাসের তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন বলুন অংশুর পিতৃপরিচয় বা পাস্ট হিস্ট্রি সম্পর্কে কতটুকু তথ্য আপনার জানা আছে?'

ডা. ঘটক বললেন, 'বিভিন্ন সময় আলোচনা প্রসঙ্গে ফাদারের মুখ থেকে যতটুকু এ ব্যাপারে আমি শুনেছি তা হল, অংশুর বাবা ছিলেন মিশরীয় আর মা ভারতীয়। কায়রোয় একটা তেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন ওর বাবা-মা। ওর মা এই চাকরির সুবাদেই মিশরে আসেন ও মিশরীয় ভদ্রলোককে বিয়ে করেন। অংশুর যখন মাত্র এক বছর বয়স তখন এক

BanglaBook.org

মোটর অ্যাক্সিডেন্টে অংশুর বাবার মৃত্যু হয় ও অংশুর মা মারাত্মকভাবে জখম হন। ভদ্রমহিলা সাময়িকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠার পর অংশুকে নিয়ে ফিরে যান ইন্ডিয়ায়। তারপর তিনি আশ্রয় নেন বেনারসের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের কাছে। ভদ্রমহিলার বাবা-মা, ভাই-বোন, নিকটাত্মীয় কেউ ছিলেন না। কিন্তু দেশে ফিরবার পর ভদ্রমহিলা আর কোনোদিন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। বছর দেড়েকের মধ্যেই ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চলে যান। যে ভদ্রলোকের কাছে অংশুকে রেখেছিলেন, বার্ধক্য এবং সম্ভবত আর্থিক কারণে তিনি আর অংশুর দায়িত্ব নিতে চাননি। তাকে তিনি তুলে দেন বেনারসের এক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের হাতে। কিছুদিন পর তাঁরা আবার অংশুকে পাঠিয়ে দেন কলকাতায় ফাদার ডিসুজার অনাথালয়ে।'

ডা. নাসের আবার প্রশ্ন করলেন, 'অংশুর বাবা-মার নাম, কায়রোয় তাঁরা কোথায় থাকতেন, কোন কোম্পানিতে চাকরি করতেন এসব সম্পর্কে কিছু জানেন কি?'

ডা. ঘটক বললেন, 'মা-র নামটা জানি, রুক্মিণী। এ ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারব না। তবে আমার কাছে একটা কাগজের ফোটোকপি আছে, হয়তো আপনি সেটা পেলে আপনার কোনো কাজে আসতে পারে।' এই বলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে ব্রিফকেসের ভিতর থেকে একটা কাগজ বের করে ডা. নাসেরের দিকে এগিয়ে দিলেন।

কাগজটা খুলতে খুলতে ডা. নাসের জিজ্ঞেস করলেন, 'কী এটা?'

'কায়রোয় অংশুর মা-র চিকিৎসা সংক্রান্ত একটা কাগজ, ফাদার ডিসুজা আমাকে দিয়েছিলেন। অংশু যখন অরফ্যান হোমে আসে তখন তার কাগজপত্রের মধ্যে এটা ছিল।' উত্তর দিলেন ডা. ঘটক।

কাগজটার উপরে বেশ কিছুক্ষণ চোখ বোলালেন ডা. নাসের। তারপর বললেন, 'কাগজটা সত্যিই আমার কাজে আসবে। একটা শেষ প্রশ্ন আমি এখন আপনাকে করতে চাই, অংশুর অসুস্থতার আগে বা পরে তার মধ্যে অন্য কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছেন কি?'

ডা. ঘটক বললেন, 'না, এমনি কোনো পরিবর্তন দেখিনি। তবে ও অসুস্থ হওয়ার কয়েক দিন আগে রাতে নাকি ঘুমের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল। তা হল, একটা অন্ধকার ঘরে নাকি একলা শুয়ে আছে ও। আর

BanglaBook.org

অন্ধকারের মধ্যে দুটো জ্বলন্ত চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ও সেখান থেকে উঠে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই উঠে বসতে পারে না। কেউ যেন ওর হাত-পা বেঁধে রেখেছে মাটির সঙ্গে। আর একটা কথাও বলেছিল ও। যেখানে ও শুয়ে থাকে সে জায়গাটা নাকি খুব ঠান্ডা। প্রত্যেকবারই ও এই একই স্বপ্ন দেখে।'

আমি এতক্ষণ শ্রোতার ভূমিকা পালন করছিলাম। ডা. ঘটকের উদ্দেশে এবার আমি বললাম, 'অংশু কিন্তু কাল রাতে আবার সেই একই স্বপ্ন দেখেছে। আজ দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে ও সেই কথাটা বলেছে আমাকে।'

ডা. নাসের বললেন, 'তার মানে ব্যাপারটা আবার ঘটতে চলেছে।'

ডা. ঘটক বললেন, 'অংশুর কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে আর দিন ছয়-সাতেকের মধ্যেই আপনি দেখতে পাবেন সেই আশ্চর্য ঘটনা। এর পর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ডা. ঘটক। তারপর ডা. নাসেরের উদ্দেশে বললেন, 'অংশুর ব্যাপারে আপনার মতামত কী?'

প্রশ্নটা শুনে ডা. নাসের প্রথমে কী যেন একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'এ ব্যাপারে এখনও মতামত দেওয়ার সময় আসেনি। তবে আমি আপনাদের কয়েকটা কথা বলি। ব্রাসেলসে যখন আমি অংশুর ব্যাপারটা প্রথম শুনি, তখন আমার মনে হয়েছিল, গ্রেট আর্টারিজে রক্ত সঞ্চালন সংক্রান্ত কোনো ত্রুটির জন্য এরকম হলেও হতে পারে। কারণ, এই সমস্যায় আক্রান্ত বছর ছয়েকের একটি ছেলের হৃৎস্পন্দন আমি মিনিট দেড়েকের জন্য স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখেছিলাম একবার। অবশ্য দ্বিতীয়বার যখন তার হৃৎস্পন্দন থেমে যায়, তখন আর তা চালু করা যায়নি। মৃত্যু হয় তার। কিন্তু আপনার মুখ থেকে অংশুর ব্যাপার শোনার পর মনের মধ্যে দুটো খটকা তৈরি হয়। এক, গ্রেট আর্টারিজে ত্রুটির জন্যে বারবার এ ঘটনা ঘটা কি সম্ভব? দুই, অংশুর দুর্বোধ ভাষায় প্রলাপ বকার ব্যাপারটা আসলে কী? এইজন্যে অংশুর ব্যাপারে মনের মধ্যে একটা কৌতূহল তৈরি হয়।

'এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমি আমার পরিচিত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা চালাই। যদিও এ ব্যাপারে তাঁরা কোনো সমাধানসূত্র আমাকে দিতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার নিছক

BanglaBook.org

গল্প ভেবে উড়িয়ে দিয়েছেন ব্যাপারটা। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের অর্থাৎ দুর্বোধ প্রলাপ বকাটা আসলে কী, তা বোঝার জন্য সেটা রেকর্ড করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলি আপনাকে।

'অডিও ক্যাসেটটা হাতে আসার পর সেটা আমি খুব ভালো করে শুনি এবং তার মর্মবস্তু আংশিক হলেও উদ্ধার করতে পারি। এবং তারপরেই বলতে গেলে অংশুর সম্পর্কে আমার আগ্রহ একশো গুণ বেড়ে যায়। কথাটা আপনাদের অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। তবু বলি, আপনারা জানেন, প্রাচীন মিশর সম্পর্কে আমি একটু-আধটু চর্চা করি। বেশ কিছু দুর্মূল্য প্যাপিরাসও আমার সংগ্রহে আছে, তার একটার চিত্রলিপির সঙ্গে হঠাৎই অংশুর প্রলাপের টুকরো টুকরো শব্দের বেশ কিছু সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছি আমি। যা বলতে গেলে এক কথায় অসম্ভব ব্যাপার!'

এর পর ডা. নাসের আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, মমির অভিশাপের মতো যেসব গল্প শোনা যায় সেসব ব্যাপার আমি বিশ্বাস করি কি না? না, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনায় আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু অংশুর কালকের একটা ব্যাপার আমার বিশ্বাসে কোথায় যেন একটু নাড়া দিয়েছে।'

আমি বললাম, 'কোন ব্যাপারটা?'

ডা. নাসের বললেন, 'কাল মিউজিয়ামের কাচের বাক্সর সামনে দাঁড়িয়ে বাক্সর ভিতরের পাত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে জেসের-জেসেরু শব্দটা উচ্চারণ করছিল। এর অর্থ রানি হাটশেপসুটের মরচুয়ারি। পিরামিডের ভিতরে শবদেহ নিয়ে ঢোকার আগে যেখানে শবদেহ এনে রাখা হত বা মমি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করা হত, সেই জায়গাকে বলা হয় মরচুয়ারি বা মরচুয়ারি মন্দির। মিউজিয়ামের কিউরেটরের কাছ থেকে আজ আমি শুনেছি ওই কাচের বাক্সর মধ্যে রাখা পাত্রগুলো সবে এক মরচুয়ারি থেকে সংগ্রহ করে মিউজিয়ামে এনে রাখা হয়েছে। মমি তৈরির সময় মৃতদেহের অন্তঃযন্ত্র শরীর থেকে বের করে ওই ফুলদানি-আকৃতির পাত্রের মধ্যে রাখা হত। পরবর্তী সময়ে মুখবন্ধ পাত্রগুলোকে একটা বাক্সে ভরে সেই বাক্সকে সমাধির মধ্যে মৃত ব্যক্তির অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে রেখে দেওয়া হত। প্রশ্ন হল, পাত্রগুলো যে মরচুয়ারি থেকে সংগৃহীত তা ওর জানার কথা নয়। যদি ও

BanglaBook.org

কোনোভাবে মরচুয়ারি সম্পর্কিত শব্দটা শুনেও থাকে, তাহলে পাত্রগুলো দেখে হঠাৎই কেন তার কথা মনে হল? অথচ অংশু কিন্তু আমাকে বলেছে, শব্দটার মানে ও জানে না।'

ডা. নাসেরের কথা শুনে আমরা দু-জনেই অবাক হয়ে গেলাম। ডা. নাসের এবার তাঁর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাত ন-টা বাজে, এখন আমাকে উঠতে হবে। কাল সকালে আমি আসব না, বিকেল বেলা আসব। সারাদিন ধরে আমাকে কাল বেশ কিছু খবর সংগ্রহ করতে হবে। আপনারা বরং সকালের দিকে কাছেই একটা বাজার আছে, সেখানে ঘুরে আসতে পারেন।' এই বলে ডা. নাসের আমাদের শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন।

৫

ভোর পাঁচটা নাগাদ টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। অংশু তখন আমার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। টেলিফোনটা ডাইনিংয়ে রাখা। আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে যাওয়ার আগেই বুঝতে পারলাম, ডা. ঘটক গিয়ে ফোনটা ধরলেন। মিনিট পাঁচেক পর ডা. ঘটক এসে টোকা দিলেন আমার ঘরে। বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। দেখলাম, তাঁর চোখে-মুখে কেমন একটা উত্তেজনার ভাব। তিনি বললেন, 'ডা. নাসের ফোন করেছিলেন, তিনি বললেন কাল সন্ধ্যেয় তাঁর বাড়িতে নাকি একটা সাংঘাতিক চুরি হয়ে গিয়েছে! বেশ কয়েকটা মূল্যবান জিনিস নিয়ে গিয়েছে চোরের দল। তিনি বেলা বারোটা নাগাদ আমাদের এখানে আসবেন। আর একটা কথা তিনি জানালেন, আজ সন্ধ্যের ট্রেনে তিনি আমাদের নিয়ে লাক্সরের উদ্দেশে রওনা হবেন। যদিও কারণটা তিনি আমাকে টেলিফোনে জানাননি।'

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে এই খবর পেয়ে আমিও খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এর পর আমি আর বিছানায় শুলাম না। মুখ-হাত ধুয়ে, ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। আস্তে আস্তে জেগে উঠছে কায়রো শহর। বাতাসে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। বেশ ভালোই লাগছিল ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকতে।

ছ-টা নাগাদ অংশুর ঘুম ভাঙল। ডা. ঘটকও ইতিমধ্যেই ফ্রেশ হয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে সাতটা বেজে গেল। ডা. ঘটক বললেন, ইচ্ছে হলে আমি সকাল বেলা কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসতে

BanglaBook.org

পারি। তবে তিনি যাবেন না। ডা. নাসের যদি আবার ফোন-টোন করেন বা হঠাৎ চলে আসেন, তাই তিনি হোটেলেই থাকবেন।

আমিও চিন্তা করলাম হোটেলে না বসে থেকে শহরটা দেখে নেওয়াই ভালো। ডা. নাসের তো আর বারোটার আগে আসবেন না! ঘণ্টা চারেক অন্তত বেড়াবার সময় পাওয়া যাবে। আমি শহর দেখতে যাব শুনে অংশুও বলল, সেও আমার সঙ্গে যাবে। ডা. ঘটক সম্মতি দিলেন। আটটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম হোটেল ছেড়ে। কিন্তু হোটেল কম্পাউন্ড ছেড়ে বড়ো রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই মনে হল, কোথায় যাব! কায়রো শহরের কিছুই তো আমাদের জানা নেই। কাছে যে বাজারটা আছে, তার কী নাম, কোনদিকে সেটা, তাও জানা নেই! ভাবলাম, হোটেলের রিসেপশন থেকে জেনে আসি। ঠিক তখনই আমার মনে পড়ে গেল কায়রো শহরের একটা জায়গার নাম, 'মাইদান তহরির'। ডা. নাসেরের মুখে শুনেছি এই নামটা। জায়গাটা নাকি শহরের প্রাণকেন্দ্র, অনেকটা কলকাতার ধর্মতলা বা বিবাদি বাগের মতো।

একটা ট্যাক্সি থামিয়ে আমরা উঠে পড়লাম। ড্রাইভার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অবিশ্রান্ত বকবক করতে করতে আমাদের নিয়ে ছুটে চলল মাইদান তহরির দিকে। পথে যেতে যেতে বিশাল বড়ো একটা বিল্ডিং চোখে পড়ল। বেশ কয়েকটা দেশের পতাকা উড়ছে সেখানে। তার প্রবেশ তোরণের সামনে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছে বিরাট পুলিশবাহিনী। ড্রাইভার জানাল এই বাড়িটাই হল আরব লিগের হেড কোয়ার্টার। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম মাইদান তহরিতে। গাড়ি থেকে নেমেই জায়গাটার মাহাত্ম্য বুঝতে পারলাম। চারদিকে সব চোখ-ধাঁধানো বড়ো বড়ো বাড়ি, অফিস, শপিংমল। ন-টা এখনও বাজেনি, কিন্তু লোকজনের ভিড় ভালোই। রাস্তায় যান চলাচলও করছে প্রচুর। যেখানে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম তার সামনেই একটা পিৎজার দোকান। যদিও প্রাতরাশ সেরে এসেছি তবুও ঢুকলাম দোকানটায়। কাউন্টারে টাকা জমা দিয়ে ল্যাম্ব পিৎজা আর দু-রকম পানীয় নিলাম। আমার জন্য কফি আর অংশুর জন্য মিল্কশেক। দোকানের ভিতরটা বেশ বড়ো। অনেক লোক বিভিন্ন টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে খাচ্ছে। কোনার দিকে একটা টেবিলে

BanglaBook.org

বসলাম আমি আর অংশু। খেতে খেতে দু-জন গল্প করতে লাগলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার কেমন লাগছে বেড়াতে?

সে বলল, খুব ভালো। কিন্তু সে একটা আক্ষেপও করল। তার হোমের বন্ধুরা নাকি কিছুতেই বিশ্বাস করবে না সে পিরামিড দেখেছে! আমি তখন তাকে বললাম, আমি যে ফোটোগুলো তুলছি তার একটা করে কপি তাকে উপহার দেব। সেগুলো দেখার পর তার বন্ধুরা নিশ্চয়ই তার কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। কথাটা শোনার পর আশ্বস্ত হল সে। কথা বলতে বলতে আমাদের খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ঠিক তখনই অংশু হঠাৎ কথা বন্ধ করে আমার পিছন দিকে তাকাল। আর তার পর মুহূর্তেই একটা প্রশ্ন আমার কানে এল, 'আপনারা কি ইন্ডিয়ান?'

আমি বসে ছিলাম দরজার দিকে পিছন ফিরে। কথাটা কানে আসার সঙ্গেসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, আমার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে একজন লোক। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি চিনে ফেললাম লোকটিকে। লোকটা হল পরশু সন্ধ্যের সেই আলতুনিয়া। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে তার প্রশ্নটা আবার করল। আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, আমরা ইন্ডিয়ান।'

এবার সে প্রশ্ন করল, 'নাসেরকে আপনারা চেনেন?'

লক্ষ করলাম, নাসের শব্দটা উচ্চারণ করার সময় তার গলায় কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল। সে কী বলতে চাইছে বুঝতে না পেরে আমি তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

আলতুনিয়া তার সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলো বের করে হাসল। তারপর বলল, 'নাসেরকে আপনারা চেনেন না, ও একটা খুনি। কায়রো শহরের যেকোনো পুরোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন, আমি সত্যি বলছি কি না।'

এই বলে আর একবার দাঁত বের করে হেসে কাচের দরজা ঠেলে দোকানের বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম খোলা দরজাটার দিকে। তারপর হাত ধুয়ে অংশুকে নিয়ে দোকানের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

আমার মনের মধ্যে শুধু ঘুরতে লাগল আলতুনিয়ার কথাটা। ডা.

BanglaBook.org

নাসেরের মুখে লোকটার সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি, তাতে এ জাতীয় লোকের মুখে মিথ্যে কথা খুব সামান্য ব্যাপার। আর ডা. নাসেরকে দেখে কখনোই মনে হয় না, তিনি একজন খুনি। হয়তো ডা. নাসেরের প্রতি বিদ্বেশবশতই সে কথাটা বলে গেল আমাকে।

এসব ভাবতে ভাবতে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম আমরা। রাস্তার পাশে বড়ো বড়ো সব দোকান, তার অধিকাংশই জামা-জুতোর। আর আছে বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন সামগ্রী বা অ্যান্টিকের দোকান। দুটো বহুতল শপিং মলের মধ্যে দিয়ে একটা লম্বা সরু গলি চলে গিয়েছে। আমরা ঢুকে পড়লাম সেই গলির মধ্যে। গলির দু-পাশে সারি সারি প্যাপাইরাস আর মিশরীয় চিত্রশিল্পের দোকান। 'প্যাপাইরাস হাউজ' নামের একটা দোকানের ভিতর ঢুকলাম আমি আর অংশু। বেশ বড়ো দোকান, ভিতরে টাঙানো রয়েছে প্যাপাইরাসের উপর আঁকা মিশরীয় চিত্রকলার অপূর্ব সব সম্ভার। ফ্যারাওদের জীবনযাত্রা, প্রাচীন মিশরের নানা দেবদেবী, বিভিন্ন ফ্যারাওদের ফোটো, পিরামিড তৈরির দৃশ্য, কী নেই সেই ফোটোর মধ্যে! নিপুণ হাতে সব কিছু আঁকা হয়েছে। একটা জিনিস লক্ষ করলাম, সব ফোটোতেই নীল রঙের ব্যবহার খুব বেশি।

কায়রো মিউজিয়াম বা গিজার পিরামিডের সুড়ঙ্গেও এই একই জিনিস লক্ষ করেছি। দোকান থেকে প্যাপাইরাসের উপর আঁকা দশটা গ্রিটিংস কার্ড কিনলাম, দেশে ফিরে তা পরিচিতজনদের উপহার দেব বলে। প্রত্যেকটা কার্ডের দাম নিল পাঁচ ইজিপ্সিয়ান পাউন্ড। দোকানের মালিক একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। কীভাবে প্যাপাইরাস থেকে কাগজ তৈরি করা হয় তা জানতে চাই শুনে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন দোকানের পিছনে কারখানায়। সেখানে জনাদশেক লোক কাজ করছে। প্রথমে প্যাপাইরাসের ডাঁটাগুলোকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর সেগুলোকে আবার লম্বালম্বিভাবে চিরে কাঠের ভারী ব্লকের নীচে চেপে কাগজ তৈরি করা হয়। দোকানের মালিক সব কিছু ঘুরিয়ে দেখালেন আমাদের। অংশুকে তিনি বেশ বড়ো এক খণ্ড কাগজও উপহার দিলেন। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে যখন আমরা দোকানের বাইরে বেরোতে যাব তখন অংশু দরজার কোনে টাঙানো একটা ফোটোর দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ভালো করে দেখতে লাগল

BanglaBook.org

ফোটোটা। আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম তার পিছনে। ফোটোটা বেশ বড়ো। আনুবিসের ফোটো, প্রাচীন মিশরের এই শিয়ালদেবতা ছিলেন মমি তৈরির দেবতা, কেউ কেউ বলেন, 'মৃত্যুর দেবতা'। ফোটোতে সে থাবা বাড়িয়ে বসে আছে। ছুঁচলো মুখ, সোনালি রঙের খাড়া কান, গলা আর মাথা কালচে নীল বর্ণের। বেশ কিছুক্ষণ ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর অংশু আমার দিকে ফিরে বলল, 'ওকে আমি চিনতে পেরেছি।'

আমি বললাম, 'কাকে?'

প্রথমে সে ফোটোটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। তারপর বলল, 'কাল রাতে স্বপ্নের মধ্যে আমি ওকে চিনতে পেরেছি। অন্ধকারের মধ্যে আমি শুয়ে ছিলাম আর দেখতে পাচ্ছিলাম ওর জ্বলন্ত চোখ দুটো। ও আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল, আমি উঠে বসতে পারছিলাম না। তারপর একসময় আস্তে আস্তে অল্প আলো ফুটে উঠল ঘরের মধ্যে। অনেক উঁচু থেকে আসছিল আলোটা। সেই আলোয় আমি দেখতে পেলাম, ও আমার সামনে বসে আছে।'

এই বলে অংশু চুপ করে গেল। আমি প্রশ্ন করলাম, 'তারপর?'

অংশু বলল, 'ওকে দেখে আমি আরও ভয় পেয়ে উঠে বসতে গেলাম। তাই দেখে ও এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। আমি উঠতে পারলাম না, ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। তারপর কী হল আমার মনে নেই। যখন চোখ খুললাম তখন দেখি, আমি বিছানায় শুয়ে আছি। ভোর হয়ে গিয়েছে।'

এর পর আর একমুহূর্ত দোকানের মধ্যে দাঁড়াল না অংশু। প্রায় ছুটেই দোকানের বাইরে বেরিয়ে রাস্তার নেমে দাঁড়াল। সেখান থেকে ট্যাক্সি ধরে সাড়ে এগারোটা নাগাদ হোটেলে পৌঁছে গেলাম আমরা। হোটেলে পৌঁছোবার পর ডা. ঘটক আমাদের জানালেন, ডা. নাসের আবার টেলিফোন করেছিলেন। গোছগাছ সব করে রাখতে হবে। সন্ধ্যে সাতটায় লাক্সরের ট্রেন। হোটেল ছেড়ে চেক আউট করতে হবে আমাদের। আমি ঘরে টুকিটাকি জিনিস ব্যাগের মধ্যে গুছিয়ে রাখতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর ডোরবেলের শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম ডা. নাসের এসে গিয়েছেন। ডা. ঘটকই গিয়ে দরজাটা খুললেন। আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ডা. নাসেরকে দেখেই বুঝলাম, তাঁর চোখে-মুখে কেমন একটা ক্লান্তির ছাপ। কালকের পোশাকটাই রয়েছে তাঁর পরনে। দেখে মনে হল, পোশাক পরিবর্তনের সময়ও তিনি

BanglaBook.org

পাননি। ভিতরে ঢুকেই তিনি প্রথমে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেলেন। এর পর অংশুর জন্য টিভি সেটটা চালিয়ে আমরা গিয়ে বসলাম ডা. ঘটকের ঘরে।

কোনোরকম ভূমিকা না করেই ডা. নাসের বললেন, 'কাল রাতে আপনাদের এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে ভাবলাম, বাড়ি চলে যাই। তারপর আবার ভাবলাম, রাত তো খুব একটা বেশি হয়নি, বরং একটা অনুসন্ধানের কাজ সেরে যাই। তাই কাল অংশুর মা-র চিকিৎসা সংক্রান্ত যে কাগজটা আপনাদের কাছ থেকে পেলাম, তাতে যে নার্সিংহোমের ঠিকানা লেখা ছিল, গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। নার্সিংহোমটা নীলনদের দ্বিতীয় সেতুর কাছে পিরামিড রোডে। নার্সিংহোমের মালিক আমার বিশেষ পরিচিত। পেশার সূত্রে আগে বেশ কয়েকবার আমি সেখানে গিয়েছি। সেখানে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল, তাদের রেকর্ড দেখে কায়রোয় অংশুর মা-বাবার ঠিকানা ইত্যাদি সংগ্রহ করা যায় কি না। মালিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে সব তথ্য আমি সংগ্রহ করলাম। এবং বলা যেতে পারে যেটুকু তথ্য আমি পাব বলে ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি তথ্য পেলাম। তবে সেসব ব্যাপার আমি আপনাদের পরে বলব, শুধু এটুকু বলে রাখি, সেখানে গিয়ে আমি জানতে পেরেছি, সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর অংশুর বাবাকেও তার মা-র সঙ্গে আনা হয় ওই নার্সিংহোমে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এবং দুর্ঘটনা ঘটার সময় অংশুও তার বাবা-মার সঙ্গে ছিল। যাই হোক, নার্সিংহোম থেকে বাইরে বেরোতে বারোটা বেজে গেল। সাড়ে বারোটা নাগাদ আমি গিয়ে পৌঁছোলাম আমার আস্তানায়। আমার ফ্ল্যাটটা তিনতলায়। গত দু-দিন ধরে কী একটা কারণে আমাদের অঞ্চলে সন্ধ্যের পর থেকেই বিদ্যুৎ থাকছে না। আসছে সেই গভীর রাতে। কালও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

'অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে আমি উপরে উঠলাম। তারপর পকেট থেকে চাবি বের করে তালাটা খুলতে যেতেই দেখি, তালাটা খোলা! ভাবলাম, হয়তো তালাটা ঠিকমতো বন্ধ করে যাইনি। কারণ, তাড়াহুড়োয় এর আগে এ-ধরনের ঘটনা দু-একবার ঘটেছে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম, আর সেই মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চলে এল। আর তার সঙ্গেসঙ্গে যা দেখলাম, তাতে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, আমার বসবার ঘরের

BanglaBook.org

সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। ছুটে গেলাম শোওয়ার ঘরে। সেখানেও একই অবস্থা। আমার আলমারি, দেরাজ সব কিছু হাট করে খোলা! বেশ কয়েক মিনিট আমার সময় লাগল ব্যাপারটা কী হয়েছে বুঝে উঠতে। তারপর বুঝলাম, চোর ঢুকেছিল ঘরে। তবে তারা সাধারণ চোর নয়। আলমারিতে হাজার দশেক ইজিপ্সিয়ান পাউন্ড ছিল। সেগুলো তারা হাতে পেয়েও নিয়ে যায়নি। কাগজপত্রগুলো তারা বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। পরে বুঝতে পারলাম, তারা কী নিয়ে গিয়েছে। নিয়ে গিয়েছে এক দুর্মূল্য প্যাপাইরাসের খণ্ডিতাংশ। বাকিটা ভল্টে রাখা ছিল বলে বেঁচে গিয়েছে। আর নিয়ে গিয়েছে অংশুর ভয়েস রেকর্ড করা সেই অডিও ক্যাসেটটা।' এই বলে থামলেন তিনি।

ডা. ঘটক প্রশ্ন করলেন, 'আপনি পুলিশে খবর দিয়েছেন?'

তিনি বললেন, 'না। কারণ, আমার ধারণা, তারা এ ব্যাপারে কিছু করতে পারবে না। শুধু শুধু ঝামেলা বাড়বে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?'

ডা. নাসের বললেন, 'হ্যাঁ হয়, আলতুনিয়াকে। কিন্তু আমার হাতে কোনো প্রমাণ নেই। বেশ কিছুদিন ধরেই ও এই প্যাপাইরাসটা হাতাবার চেষ্টা করছিল।'

ডা. নাসের আলতুনিয়ার কথা বলায় আমি একবার ভাবলাম, সকাল বেলার ঘটনাটা তাঁকে বলি। কিন্তু আলতুনিয়া বলেছে তিনি খুনি, এ কথাটা তাঁকে বলতে কেমন যেন বাধল আমার। তাই আর কথাটা তুললাম না। মনে মনে ভাবলাম, পরে ডা. ঘটককে বলব ব্যাপারটা। ডা. নাসের এর পর বললেন, 'আমি আর এখন বসব না। কায়রো ছাড়ার আগে আমাকে আরও বেশ কিছু কাজ সেরে নিতে হবে। ঠিক সময় আমি আপনাদের নিতে আসব।'

এই বলে তিনি যখন চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছেন তখন ডা. ঘটক তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?'

ডা. নাসের বললেন, 'না না। মনে করব কেন! আপনি বলুন কী জানতে চান?'

BanglaBook.org

ডা. ঘটক বললেন, 'আমরা যে আজ লাক্সর যাত্রা করব তা কি নিছকই ভ্রমণের জন্য, নাকি অন্য কিছু ব্যাপার আছে?'

ডা. নাসের বললেন, 'প্রথমত, মিশরের পুরাতত্ত্বের ভাণ্ডার বলতে লাক্সরকেই বোঝায়। আইফেল টাওয়ার না দেখলে যেমন ফ্রান্স ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না, মিশরের ক্ষেত্রে তেমনই হল লাক্সর। এটা হল ওখানে যাওয়ার একটা কারণ। আর দ্বিতীয়টা হল, আমার ধারণা লাক্সরের সঙ্গে অংশুর ব্যাপারটার কোথাও একটা যোগসূত্র আছে। এটাই আমার লাক্সর ভ্রমণের প্রধান কারণ। হয়তো লাক্সরে গেলে অংশুর অদ্ভুত অসুখের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। আমার এ ধারণা কেন হয়েছে তা আপনাদের আমি রাতে ট্রেনে যেতে যেতে বলব।'

৬

ট্রেন ছাড়তে ছাড়তে রাত আটটা বেজে গেল। স্টিম ইঞ্জিনে টানা কাঠের বগি। একটা কুপ আমরা সম্পূর্ণ বুক করে নিয়েছি। চার জনের শোওয়ার ব্যবস্থা আছে তাতে। শহর ছাড়িয়ে ট্রেন ছুটতে শুরু করল উঁচু-নীচু উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। ডা. নাসের জানালেন, মাঝরাতে একটা জংশন স্টেশন ছাড়া ভোরের আগে ট্রেন অন্য কোথাও দাঁড়াবে না। মধ্যে মধ্যে কয়েকটা ছোটোখাটো স্টেশন আছে অবশ্য। কিন্তু নির্জন স্থানে মরু-ডাকাতদের ভয় থাকায় এই ট্রেন আর আজকাল সেসব স্টেশনে দাঁড়ায় না। কায়রো থেকে লাক্সরের দূরত্ব হল, ছ-শো ছিয়াত্তর কিলোমিটার। ট্রেনে যেতে সময় লাগে বারো ঘণ্টার মতো। এর মধ্যে বেশ কিছু অংশ যেতে হয় মরুভূমির মধ্যে দিয়ে। আমি আর অংশু মুখোমুখি বসে ছিলাম জানলার পাশে। বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ ভালোই লাগছিল। কয়েক দিন পরেই মনে হয় পূর্ণিমা। প্রায় গোল চাঁদ আকাশে। তার আলোয় প্লাবিত বিস্তীর্ণ জনহীন প্রান্তর। মাঝে মাঝে নীলনদের ক্যানেলের উপর ছোটো ছোটো সেতু। ঘটাং ঘটাং শব্দে তার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। ডা. ঘটক আর ডা. নাসের নিজেদের পেশার ব্যাপারে নানা গল্প করছেন। একসময় ডা. ঘটক প্রসঙ্গ পালটে ডা. নাসেরকে বললেন, 'প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে আমার খুব একটা ধারণা নেই। আপনি যদি এ ব্যাপারে আলোকপাত করেন তাহলে ভালো হয়।'

BanglaBook.org

ডা. নাসের বলতে শুরু করলেন মিশরের ইতিহাস। আর আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে শুনতে লাগলাম তাঁর কথা। পাঁচ হাজার বছর আগে নীলনদের তীরে যে প্রাচীন সভ্যতার পত্তন হয়েছিল, তার এক সংক্ষিপ্ত ধারাবিরণী বলে চললেন ডা. নাসের। এত সুন্দর তিনি বলছিলেন বিভিন্ন ফারাওয়ের কাহিনি, পিরামিড তৈরির কাহিনি, মনে হচ্ছিল যেন তিনি সব কিছু নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমার খুব কৌতূহল ছিল কীভাবে মমি তৈরি করা হত, সে ব্যাপারে।

ডা. নাসেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, 'আগে বলে নিই কেন মমি তৈরি করা হত। মিশরীয়রা মনে করতেন আত্মা অবিনশ্বর। জাগতিক মৃত্যুর অর্থ ছিল তাঁদের কাছে শরীরের ঘুমিয়ে পড়া। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, শরীরকে যদি সংরক্ষিত করা যায়, তাহলে ঘুমিয়ে-পড়া শরীর আবার একদিন জেগে উঠবে। তারপর সমাধির মধ্যে রাখা নৌকোয় পাড়ি দেবে শেষ বিচারের জন্য অনন্তলোকের উদ্দেশ্যে। আর যাঁরা ফারাও, তাঁরা মিশে যাবেন সূর্যদেবের সঙ্গে। মমি তৈরির পদ্ধতি বিভিন্ন চিত্রলিপির মাধ্যমে জানা গিয়েছে। পিরামিডের ভিতরে বিভিন্ন দেওয়ালে, বিশেষত যেখানে সমাধি দেওয়া হত সেই কক্ষে এ জাতীয় বহু চিত্রলিপির সন্ধান মিলেছে। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তি পুরুষ মানুষ হলে তার মাথার সব চুল কামিয়ে ফেলা হত, স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে অবশ্য তা করা হত না।

'মমি তৈরি করতেন এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা। শরীরের ভিতরে যেসব অতি পচনশীল অংশ আছে, প্রথমে তা শরীরের বাইরে বের করে ফেলা হত। যেমন বঁড়শি জাতীয় বাঁকানো যন্ত্রের সাহায্যে নাকের ফুটোর মধ্যে দিয়ে বের করে আনা হত মস্তিষ্ক। সেই ফাঁকা গহ্বরে কানের ফুটো দিয়ে ভরে দেওয়া হত তরল বিটুমিন। যা ঠান্ডা হলে জমে শক্ত হয়ে যেত। পেটের বাঁ দিকে ছিদ্র করে অন্ত্র, পাকস্থলী ইত্যাদি বের করে এনে উদরগহ্বর ভালো করে সুরা দিয়ে পরিষ্কার করে তাতে ভরে দেওয়া হত ধূপ মিশ্রিত কাঠের গুঁড়ো। এভাবে সম্পূর্ণ হত মমি তৈরির প্রাথমিক কাজ। এর পর লবণে দশ সপ্তাহ চুবিয়ে রাখা হত ওই শরীর। ফলে মাংস গলে গিয়ে হাড়ের উপর পড়ে থাকত শুধু চামড়া। ওই শরীরকে দ্রবণ থেকে তুলে প্রথমে মসলিন জাতীয় সূক্ষ্ম কাপড়ে রঞ্জন মাখিয়ে সেই কাপড় জড়ানো হত মাথা

BanglaBook.org

ও মুখে। আর ব্যান্ডেজের মতো লম্বা কাপড়ের ফালি জড়ানো হত সারা দেহে। একেবার গলা থেকে হাত-পায়ের আঙুল পর্যন্ত। বিত্তশালী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে হাত-পায়ের আঙুলে পরানো হত সোনার তৈরি খাপ, মুখে মৃত ব্যক্তির মুখাবয়বের আদলে তৈরি সোনার মুখোশ। শরীর থেকে বের করে নেওয়া অন্তঃযন্ত্রগুলোকে তরল বিটুমিনে ফুটিয়ে ধাতু বা পাথরের তৈরি ফুলদানির মতো দেখতে পাত্রে ভরে রেখে দেওয়া হত সমাধিক্ষেত্রে।'

এসব নানা গল্প শুনতে শুনতে রাত দশটা বেজে গেল। ডা. নাসের সঙ্গে করে খাবার এনে ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর অংশুর হাই উঠতে লাগল। উপরের বার্থে শুয়ে পড়ল অংশু। তার কিছুক্ষণ পরই দেখলাম, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ট্রেন ছুটে চলেছে। বাইরে থেকে ভেসে আসা ঠান্ডা বাতাসে বেশ শীত শীত করতে লাগল। জানলার কাচের শার্শিগুলো নামিয়ে দিয়ে আমি ডা. নাসেরের মুখোমুখি বসলাম তাঁর কথা শোনার জন্য।

ডা. নাসের মনে হয় বুঝতে পারলেন, এর পর আমরা তাঁর কাছ থেকে কী শুনতে চাইব। তাই তিনি নিজেই বলতে শুরু করলেন, 'এবার আমি আপনাদের বলব কেন আমি আপনাদের লাক্সরে নিয়ে চলেছি। যদিও যে কথাগুলো আমি আপনাদের বলব তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে আমি অপারগ। প্রথমত, আমি আগেই আপনাদের বলেছি যে, অংশুর প্রলাপের কিছু কথার সঙ্গে এক প্রাচীন হাইয়ারোগ্লিফিক্সের বক্তব্যের যোগসূত্র আছে বলে মনে হয়। ওই হাইয়ারোগ্লিফিক আমি সংগ্রহ করি লাক্সর থেকেই। তাতে রানি হাটশেপসুটের মরচুয়ারি মন্দিরের এক কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। ওই মরচুয়ারি মন্দির লাক্সরের কাছেই অবস্থিত।

'দ্বিতীয়ত সেই মিউজিয়ামের ঘটনাটা! অংশু কী করে জানল? ওই পাত্রগুলো দেখে হঠাৎ ওই কথাটা বলল কেন? জেসের-জেসেরু? ও তো ওই শব্দের মানে জানে না! মিউজিয়ামের কিউরেটরের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আমি জেনেছি, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে জার্মান প্রত্নবিদ ড. হান্স হাটশেপসুটের মরচুয়ারি মন্দিরের নীচ থেকে ওগুলো আবিষ্কার করেছেন!

'আর তৃতীয়ত, তথ্যটাও বেশ চমকপ্রদ। অংশুর বাবা কিন্তু আদতে লাক্সরেরই মানুষ ছিলেন। লাক্সরের আখুম নামের একটা ছোট্ট গ্রামে তিনি বড়ো হয়ে ওঠেন।' এর পর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ডা. নাসের, তারপর

BanglaBook.org

বললেন, 'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন আমি লাক্সরে যাচ্ছি। আমার ধারণা, লাক্সরের মরচুয়ারি মন্দিরের সঙ্গে অংশুর একটা সম্পর্ক আছে।'

ডা. ঘটক প্রশ্ন করলেন, 'তৃতীয় তথ্যটা আপনি পেলেন কোথা থেকে?'

ডা. নাসের বললেন, 'দুর্ঘটনার পর অংশুর বাবা-মা যে নার্সিংহোমে ভরতি হন, সেই নার্সিংহোমে এক বৃদ্ধা নার্স আছেন। তিনিও একসময় আখুম গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনিই তথ্যটা দিলেন আমাকে। গতকাল আমি সেখানে গিয়েছিলাম সেকথা তো আপনারা জানেনই। আরও বেশ কিছু তথ্যও আমি সংগ্রহ করেছি তাঁর কাছ থেকে।'

ডা. ঘটক আবার প্রশ্ন করলেন, 'কী সেই তথ্য!'

ডা. নাসের বললেন, 'প্রথমত, অংশুর বাবার পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য। যেমন তাঁর বাবা-মার কোনো পরিচয় জানা যায় না। আখুম গ্রামের এক বৃদ্ধ তাঁকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছিলেন। সেই বৃদ্ধের মৃত্যুর পর জীবিকার সন্ধানে আমন অর্থাৎ অংশুর বাবা কায়রো চলে আসেন। কায়রোয় এসে তিনি তেলের কোম্পানিতে চাকরি নেন ও অংশুর মাকে বিয়ে করে ওল্ড কায়রো অঞ্চলে থাকতে শুরু করেন।

'দ্বিতীয়ত, দুর্ঘটনা প্রসঙ্গেও আমি বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি ওই বৃদ্ধার কাছ থেকে। ওই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বৃদ্ধা আমাকে যেসব কথা জানিয়েছেন তা হল, দুর্ঘটনার পর অংশুর বাবা-মাকে যখন নার্সিংহোমে আনা হয়, তখন অংশুও তাঁদের সঙ্গে ছিল। তবে সে ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত। ঘটনাচক্রে সেদিন রাতে নার্সিংহোমের ডিউটিতে ছিলেন ওই বৃদ্ধা। অংশুর বাবাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আনা হয়। সারা শরীর ছিল রক্তাক্ত। বিশেষত তাঁর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল। নার্সিংহোমে আনার পর একসময় কিছুক্ষণের জন্য তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তখন তিনি দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা হল, তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে লাক্সর থেকে বেরিয়ে কায়রোয় ফিরছিলেন। গাড়িটা তিনি এক বন্ধুর থেকে নিয়েছিলেন। দুর্ঘটনার সময় গাড়িটা তিনিই চালাচ্ছিলেন। অংশু তার মার সঙ্গে পিছনের আসনে ঘুমোচ্ছিল। রাত আটটা নাগাদ তিনি নীলনদের দ্বিতীয় সেতুর কাছাকাছি চলে আসেন ওই সেতু পার হয়ে কায়রোয় প্রবেশ করার জন্য।

BanglaBook.org

‘সেতুতে উঠবার আগে দু-পাশে ঘন জঙ্গলময় রাস্তায় যখন তিনি ঢুকলেন তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ফাঁকা রাস্তা, অন্য কোনো যানবাহন নেই। কাজেই বেশ জোরেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি। হেডলাইটের আলোয় হঠাৎই আমন দেখতে পান, বাঘের চেয়েও বিরাট আকৃতির কুকুর জাতীয় প্রাণী জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রাস্তা আটকে দাঁড়াল। তিনি তখন ওই প্রাণীটার খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন। ভয় পেয়ে ব্রেক কষতেই সঙ্গে সঙ্গে উলটে গেল গাড়ি। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারেননি আমন। ওই দিন রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। যে ট্রাকড্রাইভার তাঁদের দুর্ঘটনাস্থলে প্রথম দেখতে পেয়ে নার্সিংহোমে পৌঁছে দিয়েছিল, নার্সিংহোমের রেকর্ডে তার যে জবানবন্দি আছে তাতেও কিন্তু একটা কুকুর জাতীয় প্রাণীর উল্লেখ আছে। উলটে যাওয়া গাড়িটা দেখতে পেয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়েছিল ড্রাইভার আর তার এক সঙ্গী। দুমড়েমুচড়ে যাওয়া গাড়ির ভিতর থেকে অনেক কষ্টে তারা বের করে আনে অংশুর বাবা-মাকে। তাঁরা দু-জনেই ছিলেন সংজ্ঞাহীন। অংশু কিন্তু গাড়ির মধ্যে ছিল না। হঠাৎ রাস্তার পাশে একটা ঝোপের মধ্যে থেকে শিশুকণ্ঠের কান্নার শব্দে সেদিকে এগিয়ে যায় তারা। ট্রাকের হেডলাইটের একটা অস্পষ্ট আলো তেরছাভাবে গিয়ে সেখানে পড়েছিল।

‘ঝোপের কাছাকাছি গিয়ে সেই আলোয় তারা দেখতে পায়, ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে একটা শিশু। আর তার মাথার কাছে বসে রয়েছে একটা কুকুর বা শিয়ালজাতীয় প্রাণী। অন্ধকারে তার চোখ দুটো জ্বলছে। তারা আরও কয়েক পা সেদিকে এগোতেই হঠাৎই প্রাণীটা যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। অবশ্য সেই প্রাণীটার আকৃতির ব্যাপারে ট্রাকড্রাইভার বিশেষ কিছু বলেনি। হতে পারে সেটা নিতান্তই সাধারণ কুকুর বা শিয়াল। আসলে দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালিয়ে আসার ফলে ক্লান্তিতে ওই কুকুর বা শিয়াল দেখে দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছিল অংশুর বাবার। যাই হোক, এর পর তিন জনকেই উদ্ধার করে ট্রাকড্রাইভার ও তার সঙ্গী নার্সিংহোমে পৌঁছে দিয়েছিল।’ ডা. নাসের এবার একটু থামলেন। তারপর বললেন, ‘আশা করি এবার কেন আমরা লাক্সরে যাচ্ছি এবং অংশুর ব্যাপারটার মধ্যে যে অন্যরকম রহস্য লুকিয়ে আছে সে সম্বন্ধে আমি আপনাদের

BanglaBook.org

মোটামুটি ধারণা দিতে পারলাম।' এরপর ডা. নাসের একদম চুপ করে গিয়ে উপরে শুয়ে থাকা ঘুমন্ত অংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করতে লাগলেন।

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় বারোটা বাজতে চলেছে। ডা. নাসের নিজের জায়গায় একইভাবে বসে রইলেন। আর ডা. ঘটক অংশুর নীচের বার্থে শোওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলেন। আমিও শুয়ে পড়ব, কিন্তু তার আগে একবার বাথরুম যাওয়ার জন্য কুপ থেকে করিডোরে এসে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা বাতাস এসে লাগল আমার গায়ে। করিডোরের উজ্জ্বল আলোগুলো সব নিভে গিয়েছে। শুধু হালকা একটা নীল আলো ছড়িয়ে আছে। আমি সামনের খোলা জানলাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। চোখে পড়ল অপূর্ব এক দৃশ্য। সম্ভবত মরুভূমির মধ্যে দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। যত দূর চোখ যায় চারদিকে জ্যোৎস্না ভেজা উঁচু-নীচু নির্জন বালিয়াড়ি, কেমন যেন একটা মায়াবি পরিবেশ। পৃথিবী ছাড়িয়ে আমরা যেন ছুটে চলেছি অন্য কোনো জগতের উদ্দেশে। বেশ কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে। বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়ালে ঠান্ডা লেগে যাবে। তাই এর পর করিডোর দিয়ে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম কম্পার্টমেন্টের শেষ প্রান্তে, বাথরুমের সামনে।

BanglaBook.org

দু-পাশে দুটো বাথরুম আর তারপরেই অন্য কম্পার্টমেন্ট যাওয়ার ভেস্টিবিউল। আমি প্রথমে ডান দিকের বাথরুমের দরজাটা ঠেললাম। কিন্তু সেটা খুলল না। বুঝতে পারলাম লোক আছে, কারণ দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। তারপর আমি বাঁ-দিকের বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। মিনিট দু-এক পর আমি বাথরুম থেকে বেরোলাম। দেখি, উলটো দিকের বাথরুমের দরজাটা খোলা। সম্ভবত যে এতক্ষণ বাথরুমে ছিল দরজা বন্ধ করতে সে ভুলে গিয়েছে। বাথরুম থেকে করিডোরে ঢুকতেই আমার চোখে পড়ল, একটা লোক কম্পার্টমেন্টের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমিও নির্জন করিডোর দিয়ে আমার কুপের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কুপগুলো সব নিস্তব্ধ। সকলেই শুয়ে পড়েছে। আমাদের কুপের আলোটাও নিভে গিয়েছে। আমাদের কুপের ঠিক সামনে যখন চলে এসেছি, ঠিক তখনই আমার সামনের লোকটা কম্পার্টমেন্টের শেষ প্রান্তে পৌঁছে

একটা বাঁক নিল। সেখানে একটা মৃদু আলো জ্বলছিল। লোকটা বাঁক নিয়ে কুপের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ার আগের মুহূর্তে আলোটা এসে পড়ল তার মুখের উপর। তার মুখের এক পাশ আমি দেখতে পেলাম। আর কেন জানি না, সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাকে চিনে ফেললাম। লোকটা হল আলতুনিয়া! তাহলে কি সেও আমাদের সঙ্গে লাক্সরে চলেছে! কিন্তু কেন? কুপের ভিতর ঢুকে দেখি, ডা. ঘটক আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন। আর ডা. নাসের একইভাবে বসে বসে কী চিন্তা করছেন। তাঁকে দেখে আমি উত্তেজনা চাপতে না পেরে বলেই ফেললাম আলতুনিয়াকে দেখার ব্যাপারটা। কথাটা শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তিনি বললেন, 'কোন দিকে?'

আমি আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলাম। ডা. নাসের সঙ্গে সঙ্গে কুপ থেকে বেরিয়ে সেদিকে এগোতে লাগলেন। আমিও তাঁর পিছু নিলাম। কম্পার্টমেন্টের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলাম আমরা। কিন্তু সেখানে কেউ নেই! চোখে পড়ল ভেস্টিবিউলের দরজাটা কে যেন উলটো দিক থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। হয়তো সে-ই পাশের কম্পার্টমেন্টে চলে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। ডা. নাসের বেশ কয়েকবার দরজাটার গায়ে ধাক্কা দিলেন। কিন্তু সেটা কেউ খুলল না। অগত্যা আমরা আবার ফিরে এলাম নিজেদের কুপে। কুপে ঢোকার পর ডা. নাসের শুধু একবার বললেন, 'আমার দৃঢ় ধারণা, আমার বাড়িতে যে চুরিটা হয়েছে সেটা ওরই কাজ। প্যাপাইরাস ও অংশুর ক্যাসেটটার মর্মবস্তু কিছুটা হলেও ও নিশ্চিত উদ্ধার করেছে, যে-কারণে ও আমাদের পিছু নিয়েছে।'

আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ কুপের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বার্থে উঠে শুয়ে পড়লাম। আলতুনিয়া সত্যিই কি চুরি করেছে? সে কি সত্যই আমাদের ফলো করছে? অংশুর ব্যাপারটা আসলে কী? এসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে ট্রেনের দুলুনিতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

৭

লাক্সর আধুনিক শহর। তার গা ছুঁয়ে বয়ে চলেছে নীলনদ। নীলনদের জল এখানে সত্যিই ঘন নীল। নদীর তীরে উর্বর পলিমাটিতে উন্মেষ হয়েছিল এক প্রাচীন সভ্যতার। তখন তার নাম ছিল 'থিবস'। দু-হাজার বছরের

BanglaBook.org

বেশি সময় ধরে থিবসই ছিল ফ্যারাওদের লীলাভূমি। মৃত্যুর পরেও হাজার হাজার বছর ধরে তাঁরা শায়িত ছিলেন এই থিবসের মাটিতেই। লাক্সরের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বিরাট বিরাট স্থাপত্যশিল্প আজও সাক্ষ্য বহন করে চলেছে প্রাচীন ফ্যারাওদের গৌরবোজ্জ্বল দিনের। তবে শহরের মাঝে দাঁড়িয়ে সেসব কিছুর চিহ্নমাত্র দেখতে পাওয়া যায় না। তার জন্য যেতে হয় শহরের বাইরে। ঝকঝকে রাস্তাঘাট, বড়ো বড়ো বাড়িঘর, শপিং মল, এয়ারপোর্ট, সব মিলিয়ে যেকোনো আধুনিক শহরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে লাক্সর।

ট্রেন থেকে নামার পর সকাল ন-টা নাগাদ আমরা পৌঁছোলাম শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত হোটেল ক্লিওপেট্রায়। ডা. নাসের কায়রো থেকে টেলিফোনে আগেই হোটেল বুকিং করে রেখেছিলেন। স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে হোটেলে আসবার পথে ড্রাইভারের সঙ্গে একটা চুক্তি করে ফেললেন। চুক্তিটা হল, যত দিন আমরা লাক্সরে থাকব তত দিন সে আমাদের সঙ্গে থাকবে। তার জন্য তাকে প্রতিদিন একশো পাঁচ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ইজিপ্সিয়ান পাউন্ড দিতে হবে। ডা. নাসের আমাদের জানালেন, লাক্সরে নাকি সব কিছুর দাম মার্কিন ডলারের হিসেবে ঠিক করা হয়। সম্ভবত অনেক আমেরিকান আর ইউরোপীয় পর্যটক এখানে আসেন বলেই এই নিয়ম। ক্লিওপেট্রা, কায়রোর হোটেল রোসেটার মতো বিশাল না হলেও, মন্দ নয়। অনেকটা বাংলো প্যাটার্নের তৈরি দোতলা হোটেল। আমরা দোতলায় দুটো পাশাপাশি ঘরে জায়গা পেলাম। ঠিক হল, তার একটায় থাকবেন দুই ডাক্তার, অন্যটায় আমি আর অংশু। ডা. নাসেরের মুখে শুনলাম, দুটো ঘরের বেশি পাওয়া যায়নি। কারণ, যে জার্মান দলটা হাটশেপসুটের মন্দিরের কাছে খননকার্য চালাচ্ছে, তারা গত তিন মাস ধরে এই হোটেলেই আছে। তাদের দলনেতার নাম হান্স, বললেন ডা. নাসের। খবরের কাগজ পড়েই তিনি তাঁর নামটা জেনেছেন। তবে এও বললেন যে, একই হোটেলে যখন উঠেছেন তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হতে নিশ্চয়ই খুব একটা দেরি হবে না।

হোটেলে পৌঁছোবার ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে স্নান-খাওয়া সেরে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম আমরা। অংশুকে নিয়ে আমি যখন ঘরের

BanglaBook.org

বাইরে পা রাখতে যাব তখন আমার ঘরে ঢুকলেন ডা. নাসের ও ডা. ঘটক। তাঁরা দু-জনেই বাইরে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি। ঘরে ঢোকার পরই ডা. নাসের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। আমি কিছু বুঝতে না পেরে তাকালাম ডা. ঘটকের দিকে। তিনি বললেন, 'ডা. নাসের তোমার জিম্মায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস রাখতে চান।'

আমি বললাম, 'কী জিনিস?'

ডা. নাসের এবার তাঁর পকেট থেকে বের করলেন একটা লম্বা কৌটো। কৌটোটা দেখতে ঠিক ঠান্ডা পানীয়ের ক্যানের মতো। ডা. নাসের তার মধ্যে থেকে বের করে আনলেন রোলকরা কাগজের মতো জিনিস। তারপর তিনি সেটা মেলে ধরলেন খাটের উপর। দেখলাম, সেটা আসলে একটা প্যাপাইরাস। দৈর্ঘ্যে ইঞ্চি পাঁচেক হলেও প্রস্থে প্রায় তিন ফুট। জিনিসটা যে অতি প্রাচীন তা দেখলেই বোঝা যায়। জিনিসটার মধ্যে ছোটো ছোটো ছবির মতো হাইয়ারোগ্লিফিক্স আঁকা রয়েছে। কিছু জায়গা তার অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত বয়সের জন্যেই এমন হয়েছে। জিনিসটা কিছুক্ষণ খাটের উপর মেলে ধরার পর ডা. নাসের আবার সেটা আগের মতো গুটিয়ে ফেলে বললেন, 'এটা আরও লম্বা ছিল। বলতে পারেন এটা অর্ধেক মাত্র। বাকি অর্ধেকটা সেদিন আমার বাড়ি থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে। এটাও যেত। কিন্তু ব্যাঙ্কের ভল্টে ছিল বলে বেঁচে গিয়েছে। এই প্যাপাইরাসের বয়স তিন হাজার বছরেরও বেশি। এর অর্ধেকটা আমার বাড়ি থেকে কে হস্তগত করেছে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমার ধারণা সে এটাও হাতাবার চেষ্টা করবে। তাই এটা আপনার কাছে লুকিয়ে রাখতে চাই।' এই বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আমার কাছে! কিন্তু কোথায়?'

ডা. নাসের আঙুল তুলে খাটের উপর রাখা আমার ক্যামেরার ব্যাগটা দেখিয়ে দিলেন। আমি বললাম, 'ওর মধ্যে? যে কেউই তো ওর মধ্যে থেকে জিনিসটা ছিনিয়ে নিতে পারে।'

ডা. নাসের বললেন, 'প্যাপাইরাসটা ওর মধ্যে থাকবেও, আবার থাকবেও না।'

আমি তাঁর অদ্ভুত কথা শুনে বললাম, 'মানে?'

BanglaBook.org

তিনি হেসে বললেন, 'আপনি ব্যাগটার মধ্যে থেকে আগে সব জিনিসপত্র বের করুন।'

তাঁর কথামতো ব্যাগটার মধ্যে থেকে সব কিছু বের করে ফেললাম। সব কিছু বলতে ক্যামেরা, দুটো টেলিলেন্স আর গোটাকতক রঙিন ফিলটার, ইউ ভি ফিলটারের চাকতি। ডা. নাসের একটা টেলিলেন্স হাতে নিয়ে বললেন, 'এর মাথার দিকের কাচটা খোলা যায় তো?'

আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ।'

সঙ্গেসঙ্গেই বুঝতে পারলাম তিনি কী বলতে চাইছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল কাজটা। রোলকরা প্যাপাইরাসটা দিব্যি ঢুকে গেল টেলিলেন্সের ভিতরে। বাইরে থেকে যাতে বোঝা না যায়, তার জন্য আমি তার মুখে পরিয়ে দিলাম একটা নীল রঙের কাচের ফিলটার। ব্যস, আর কোনো কিছু বোঝার উপায় রইল না। অংশু অবাক হয়ে সব কিছু দেখল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। অংশু বসল ড্রাইভারের পাশে, আর আমরা তিন জন বসলাম পিছনে। আমি ভেবেছিলাম, আমরা নিশ্চয়ই হাটশেপসুটের মরচুয়ারিতে যাব। কিন্তু ডা. নাসের ড্রাইভারকে কার্নাক যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। যদিও কার্নাক আর হাটশেপসুটের মন্দির একই পথে না আলাদা পথে, সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না। নীলনদের গা বেয়ে ঝকঝকে রাস্তা ধরে গাড়ি চলতে শুরু করল। স্টেশন থেকে হোটেলে আসার পথে বা কার্নাক যাওয়ার পথে একটা জিনিস লক্ষ করলাম, লাক্সরের প্রধান রাস্তাগুলো সবই প্রায় নীলনদের পার ধরে তৈরি হয়েছে। রাস্তায় চলতে চলতেই গাড়ির ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে নীলনদের বুকে ভেসে চলা সাদা রঙের বিরাট বিরাট ক্রুজ জাহাজ বা প্রমোদতরী আর পালতোলা নৌকোগুলোকে। এমনকী প্রমোদতরীর ডেকে দাঁড়ানো মানুষদেরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ডা. নাসের বললেন, 'লাক্সরের তিনটে অংশ। এক, লাক্সর শহর, দুই, নীলনদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত ফ্যারাও এবং তাঁর রানিদের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র ভ্যালি অব কিংস ও ভ্যালি অব কুইনস এবং তিন, শহরের উত্তর-পূর্ব কোনে অবস্থিত কার্নাক। কার্নাক হল আসলে একটা গ্রাম।

BanglaBook.org

ওখানে আজও প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিশরীয় স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কার্নাক মন্দির। আমি অন্তত তিরিশবার গিয়েছি ওখানে। কিন্তু প্রতিবারই আমার মনে হয়েছে, যেন প্রথমবার পা রাখলাম কার্নাকের মন্দির চত্বরে। এমনই বড়ো, এমনই তার সৌন্দর্য, তার প্রতিটি সোপানশ্রেণি, প্রতিটি পাথর, স্তম্ভমূর্তি যেন স্মরণ করিয়ে দেয় ফ্যারাওদের গৌরবোজ্জ্বল নানা অধ্যায়ের কথা।'

শহর ছাড়িয়ে কিছু দূর এগোবার পর একসময় দূরে চোখে পড়ল সেই মন্দির। যত তার দিকে এগোতে লাগলাম ততই যেন তার বিশাল আকৃতি চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। শেষে একসময় আমরা এসে দাঁড়ালাম কার্নাকের বিশাল মন্দির চত্বরে। পাথর-বসানো এই মন্দির চত্বরটা এত বড়ো যে, গোটা তিনেক ফুটবল মাঠ অনায়াসে তার মধ্যে ধরে যায়। তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা বিরাট স্তম্ভগুলো যেন আর একটু এগোলেই হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারবে আকাশটাকে। গাড়ি থেকে নামার পর ডা. নাসের আমাদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে টিকিট কাটতে গেলেন। মন্দির চত্বরে প্রচুর পর্যটকের ভিড়। তাদের মধ্যে অধিকাংশ সাদা চামড়ার বিদেশি পর্যটক। এই ভিড় গিজার পিরামিড বা কায়রো মিউজিয়াম দেখতে যাওয়ার সময়ও চোখে পড়েনি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই টিকিট কেটে ফিরে এলেন ডা. নাসের। এর পর আমরা ঢুকলাম মূল মন্দির চত্বরে। সেখানে ঢুকতে ঢুকতে ডা.

BanglaBook.org

নাসের বললেন, 'আমরা এখন যে বিশাল স্থাপত্যের সঙ্গে পরিচিত হব, তা কিন্তু একজনের রাজত্বকালে তৈরি হয়নি। থিবান রাজত্বকাল থেকে শুরু করে রোমানদের সময় পর্যন্ত বহু রাজার সাক্ষ্য বহন করছে এই মন্দির। তবে এই মন্দির প্রাথমিক অবস্থায় অবশ্য তৈরি হয়েছিল থিবসের থিবান দেবতাদের উদ্দেশ্যে। ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিসের আমলে ও তার পরবর্তী পর্যায়ে এই মন্দিরের স্থাপত্যশিল্পে উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ সাধিত হয়।'

মন্দিরে ঢোকার দু-পাশে সার সার ভেড়ামুখো স্ফিংক্স বসানো আছে। প্রত্যেক স্ফিংক্সের সামনের দুই থাবার মাঝে একজন করে ফ্যারাওয়ের মূর্তি।

ডা. নাসের আমাদের এই ভেড়ামুখো স্ফিংক্সগুলো দেখিয়ে বললেন, 'আপনারা জানেন যে, প্রাচীন মিশরের প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্যদেব। ফ্যারাওরা নিজেদের তাঁর অংশ বা সন্তান বলে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। আসলে ঐশ্বরিক ব্যাপারটা ফ্যারাওদের নামের সঙ্গে যুক্ত রাখা হত ধর্মভীরু প্রজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। ভেড়ামুখো স্ফিংক্স আসলে হচ্ছে সূর্যদেব বা আমনের প্রতিমূর্তি। আর ওঁদের থাবার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিগুলো সবই আসলে ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিসের মূর্তি। এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে, পিতা সূর্যদেব বা আমন রক্ষা করছেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রামেসিসকে। আর একটা কথা আমি আপনাদের বলি, ফ্যারাওদের ঐশ্বরিক ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি প্রচার করতেন সমাজের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ অথবা পুরোহিতরা। নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই তাঁরা এসব করতেন। লুকোনো মাটির নীচের সুড়ঙ্গপথে তাঁরা হাজির হতেন আমনের মূর্তির পিছনে। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা বক্তব্য রাখতেন। মূর্তির সামনে জড়ো-হওয়া মানুষরা ভাবত স্বয়ং আমনই বলছেন ওইসব কথা। কার্নাক মন্দিরের নির্মাতা আমেনহোটেপের যখন জন্ম হয় তখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছিল। কেউ যাতে সদ্যোজাত আমেনহোটেপের কোনো ক্ষতি করতে না পারে তাই কৌশলী প্রধান পুরোহিত আমনের মূর্তির পিছনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যে শিশু জন্ম নিয়েছে সে আমার সন্তান। শুনে সকলে ভেবেছিল স্বয়ং সূর্যদেবই ঘোষণা করলেন কথাটা।'

ডা. নাসেরের কথাগুলো ভবিষ্যতে আমার কাজে আসতে পারে ভেবে পকেট ডায়েরিতে নোট করে নিলাম। পাথর-বাঁধানো পথ বেয়ে এসে

BanglaBook.org

দাঁড়ালাম কার্নাক মন্দিরের প্রথম তোরণের সামনে। চল্লিশ ফুটেরও বেশি উঁচু হবে এই তোরণ, ঘাড় উঁচু করে দেখতে হয়। তবে তার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। প্রথম তোরণ অতিক্রম করে আমরা এসে দাঁড়ালাম চারদিক প্রাচীর দেওয়া একটা খোলা জায়গায়। প্রাচীরের গায়ে আঁকা ও খোদাই করা নানাধরনের ছবি।

ডা. নাসের বললেন, 'এ ছবিগুলো মিশরের চলন্ত ইতিহাস! নানাধরনের ছবি আছে। তাতে ফ্যারাওদের রাজ্যাভিষেকের দৃশ্য, তাদের বিচারালয়, ফ্যারাও এবং সেই সময়ের মিশরবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, উৎসব থেকে শুরু করে একদম শেষযাত্রার দৃশ্য পর্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লক্ষ করলাম, অংশু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সেগুলো। এতটাই মনোযোগ দিয়ে সে ছবিগুলো দেখার চেষ্টা করছে যে, মাঝে মাঝে সে আমাদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে। আর একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম, ডা. নাসের আমাদের বোঝার সুবিধের জন্য নানা কথা বলছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আসলে অংশুর মুখের উপর নিবদ্ধ। মনে হল, তিনি যেন ছবিগুলো দেখার সময় অংশুর মুখের অভিব্যক্তি পড়ার চেষ্টা করছেন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা হাজির হলাম দ্বিতীয় তোরণের সামনে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটা ফোটোও তুলে নিলাম। দ্বিতীয় তোরণের একটু আগে দাঁড়িয়ে ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিসের বিশাল দুটো মূর্তি। দ্বিতীয় তোরণ পেরিয়ে আমরা ঢুকলাম বিরাট একটা হলঘরে। এত বড়ো হলঘর আমি এর আগে কখনো দেখিনি। দানবাকৃতির অসংখ্য স্তম্ভ ধরে রেখেছে মাথার উপরে পাথুরে ছাদকে। হলঘরের মধ্যে আলোআঁধারি খেলা করছে। একটু জোরে কথা বললেই সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে কানে। বেশ মজা লাগছে শুনতে। ডা. ঘটককেও দেখলাম, তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ভুলে দু-বার জোরে জোরে 'অংশু অংশু' বলে ডাকতে। সঙ্গেসঙ্গেই অংশু ডাকটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। অংশুও হাততালি দিতে লাগল। ডা. নাসেরের মুখে শুনলাম, এর নাম 'হাইপোস্টাইল হল'। অসংখ্য ছোটো-বড়ো মূর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা আছে বিভিন্ন জায়গায়। ডা. নাসের আমাদের সব কিছু বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। হাইপোস্টাইল হল থেকে বেরিয়ে একের পর এক তোরণ পেরিয়ে আমরা এসে দাঁড়ালাম অপেক্ষাকৃত ছোটো মাপের ষষ্ঠ তোরণের

BanglaBook.org

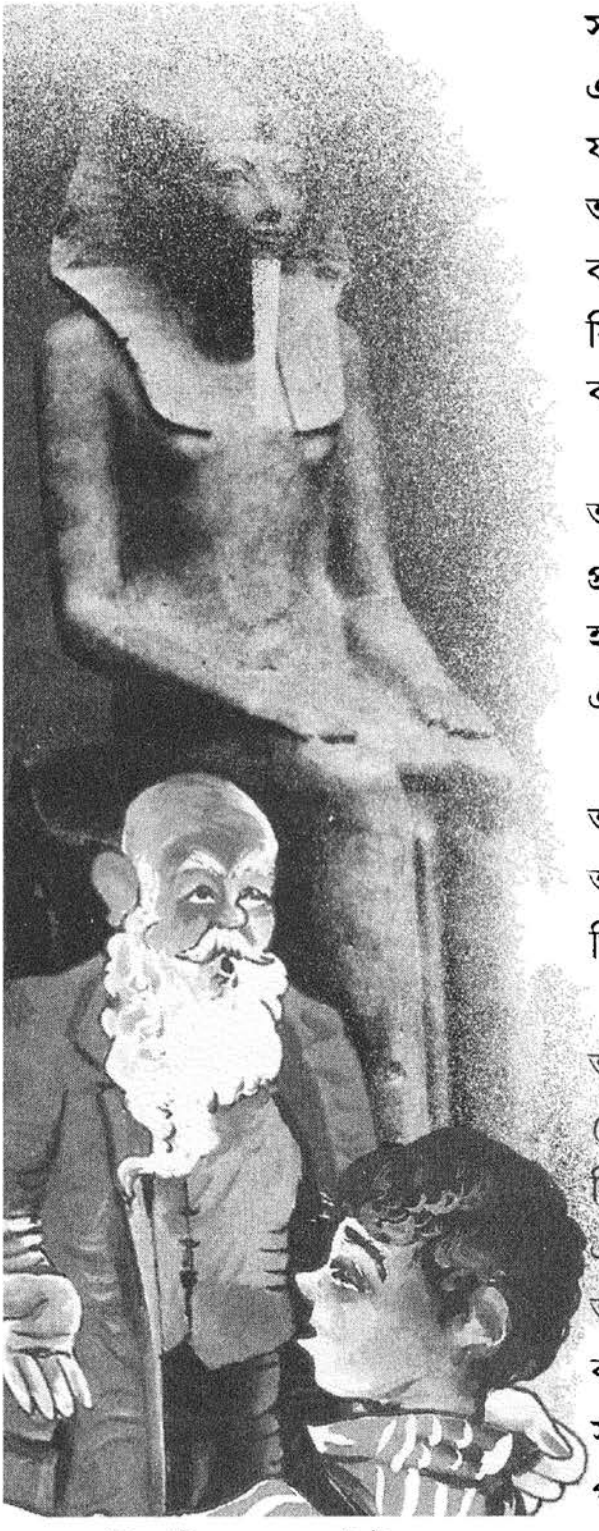

সামনে। ডা. নাসের জানালেন, এই ষষ্ঠ তোরণ তৈরি করান ফ্যারাও তৃতীয় টুথমোসিস এবং আগের পঞ্চম তোরণটি তৈরি করান ফ্যারাও প্রথম টুথমোসিস, যিনি ছিলেন রানি হাটশেপসুটের বাবা।

হাটশেপসুটের কথা শুনে আমি আগ্রহী হয়ে ডা. নাসেরকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, হাটশেপসুটের তৈরি কিছু নেই এখানে?'

ডা. নাসের বললেন, 'আছে। আপনি দেখতে চান? তাহলে আমার সঙ্গে আসুন।' এই বলে তিনি আবার পিছনে ফিরলেন।

তাঁর পিছন পিছন গিয়ে আমরা হাজির হলাম চতুর্থ তোরণের কাছে, যে জায়গাটা কিছুক্ষণ আগেই পেরিয়ে এসেছিলাম আমরা। তিনি আমাদের নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালেন একটা দেওয়ালের সামনে। তার গায়ে রয়েছে পাথরে খোদাইকরা বিভিন্ন মূর্তি ও নানা ছবি। কিন্তু কোনোটাই অক্ষত অবস্থায় নেই। বিশেষত, ফ্যারাওদের মুখগুলো প্রায় সবকটাই ভাঙা।

কিছুটা অক্ষত একটা ফ্যারাও মূর্তি দেখিয়ে ডা. নাসের বললেন, 'এটাই হল হাটশেপসুটের মূর্তি। রানি হাটশেপসুট পুরুষদের মতো পোশাক

BanglaBook.org

পরতেন। এখানকার দেওয়ালে খোদিত ফ্যারাও মূর্তিগুলো সবকটাই হাটশেপসুটের। তবে মূর্তিগুলোকে যে আপনারা ভাঙা দেখছেন, তা কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে নয়। আসলে মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। রানি হাটশেপসুট তাঁর পঁচিশ বছরের রাজত্বকালে কার্নাক মন্দিরের বিভিন্ন দেওয়ালে এ জাতীয় অনেক মূর্তি খোদাই করান। কিন্তু হাটশেপসুটের মৃত্যুর পর তৃতীয় টুথমোসিস সিংহাসনে বসে লাক্সর সহ মিশরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাঁর সমস্ত কীর্তি ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। আসলে একজন মহিলাকে তিনি তাঁর পূর্বসূরি বলে মানতে চাননি। একমাত্র মরচুয়ারি মন্দিরই এই ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পায়। সম্ভবত কোনো ধর্মীয় কারণেই ফ্যারাও তৃতীয় টুথমোসিস মরচুয়ারি মন্দিরে হাত দেননি।'

কার্নাক মন্দির দেখতে আমাদের ঘণ্টা তিনেক কেটে গেল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ মন্দির চত্বরে বসে গল্প করলাম আমরা।

কথা প্রসঙ্গে ডা. নাসের বললেন, 'আমি আপনাদের প্রথমে এখানে নিয়ে এলাম দুটো কারণে। প্রথমত, কার্নাক মন্দির মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান। পরে যদি কোনো কারণে আপনাদের দেখাতে না পারি তাই আগেই দেখিয়ে রাখলাম। দ্বিতীয়ত, আলতুনিপ্পা যদি সত্যিই পিছু নিয়ে এখানে এসে থাকে তাহলে আমাদের এখানে আসায় সে কিছুটা বিভ্রান্ত হবে। কারণ, সে নিশ্চয়ই হাইয়ারোগ্লিফিকটা পড়েছে, এ ব্যাপারে তাকে বিশেষজ্ঞও বলা যেতে পারে। কাজেই তার নিশ্চয়ই ধারণা ছিল যে, লাক্সরে নেমেই আমরা প্রথমে ছুটব হাটশেপসুটের মরচুয়ারির দিকে। হয়তো সে এখন গিয়ে বসে আছে হাটশেপসুটের মরচুয়ারি মন্দিরে। আমরা কাল ভোরে রওনা হব সেদিকে।'

অংশু একসময় আমাদের চেয়ে একটু দূরে গিয়ে একটা স্ফিংক্সের থাবার উপর চড়ে বসল। সেই সুযোগে আমি আমার মনের মধ্যে জমে থাকা বেশ কয়েকটা প্রশ্ন ডা. নাসেরকে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে ফেলাম, 'আচ্ছা প্যাপাইরাসে ঠিক কী লেখা আছে? তার সঙ্গে অংশুর কথার কোথায় মিল আছে? হাটশেপসুটের মরচুয়ারির সঙ্গে সেসবের সম্পর্কটাই বা কী?'

ডা. নাসের হয়তো উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অংশু স্ফিংক্সের উপর থেকে নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

BanglaBook.org

ডা. নাসের বললেন, 'একথা এখন থাক, পরে আপনাদের সব বুঝিয়ে বলব।'

কার্নাক মন্দির ছেড়ে আমরা যখন হোটেলে ফেরার জন্য গাড়িতে উঠে বসলাম, সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। তার লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে কার্নাক মন্দিরের পাথুরে স্তম্ভে।

৮

ভোর ছ-টার মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে পড়লাম আমরা। স্নান সেরে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে যখন আমরা হোটেলের বাইরে পা রাখলাম, তখন ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা বাজে। সঙ্গে দুটো ছোটো ব্যাগে হালকা কিছু জিনিসপত্র নিয়েছি। কারণ, রাতে আর হোটেলে ফিরব না আমরা। কার্নাক মন্দির থেকে হোটেলে ফিরে আসার পর আমাদের সঙ্গে ডা. হান্সের পরিচয় হয়েছে। হান্স হলেন সেই জার্মান প্রত্নবিদ, যাঁর নেতৃত্বে হাটশেপসুটের মরচুয়ারির কাছে খননকার্য চলছে। তাঁকে না দেখার আগে আমার ধারণা ছিল, তিনি মনে হয় প্রবীণ মানুষ হবেন। কিন্তু দেখলাম, তিনি একজন বছর তিরিশের তরতাজা যুবক। চেহারাটাও খুব সুন্দর। দীর্ঘ শরীরে কোথাও একফোঁটা বাড়তি মেদ নেই। মাথায় একরাশ সোনালি রঙের ঝাঁকড়া চুল, নীল রঙের উজ্জ্বল চোখ, নাক-মুখ সব কিছুই যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা। কথাবার্তাতেও বেশ একটা সপ্রতিভ ভাব আছে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমাদের সকলেরই বেশ ভালো লেগেছে। হান্স মাঝে মাঝে রাতে থেকে যান মরচুয়ারির কাছে ফেলা তাঁবুতে। খননকার্যের শ্রমিকরা ওখানেই থাকে। আগামীকাল পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নার আলোয় নাকি আশ্চর্য সুন্দর লাগে সেই রহস্যময় উপত্যকা। তাই তাঁরই আমন্ত্রণে আমরা দুটো রাত কাটাতে চলেছি সেখানে। তিনি অবশ্য আরও ভোরে সেদিকে রওনা হয়ে গিয়েছেন। ওখানেই তাঁর সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হওয়ার কথা।

হোটেলের বাইরে মিনিট দশেক আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হল গাড়ির জন্য। গাড়ি আসার পর ড্রাইভার জানাল, তার নাকি টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছিল। তাই আসতে দেরি হল। যাই হোক, আমরা চেপে বসলাম গাড়িতে। আমাদের গন্তব্য নীলনদের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল। গাড়ি শহর

BanglaBook.org

ছাড়িয়ে নীলনদের ব্রিজ পেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল এক অজানা প্রান্তরে। তার বুক চিরে চলেছে মসৃণ কালো রাস্তা। সবেমাত্র আটটা বাজে। কিন্তু এর মধ্যেই রোদের তেজ বাড়তে শুরু করেছে। বেশ গরম লাগছে। অনেক দূরে আকাশের কোলে একটা কালো রেখা।

ডা. নাসের বললেন, আমরা নাকি যাচ্ছি ওখানেই। কালো রেখাটা আসলে পাহাড়শ্রেণি। ওই পাহাড়ি উপত্যকাতেই শায়িত আছেন প্রাচীন মিশরের ফ্যারাও এবং তাঁদের রানিরা। আর তার কাছেই রয়েছেন রানি হাটশেপসুটের মরচুয়ারি মন্দির।

আমি ডা. নাসেরকে রানি হাটশেপসুটের সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ করলাম। তিনি বলতে শুরু করলেন, 'প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে বেশ কয়েকজন রানির নাম শোনা যায়, যাঁরা বিভিন্ন কারণে বিখ্যাত। তাঁদের মধ্যে নেফারতিতি ও ক্লিওপেট্রার নাম প্রায় সকলেই জানে। গল্প-কাহিনির দৌলতে তাঁদের নাম ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। রানি নেফারতিতি বা রানি ক্লিওপেট্রা বিখ্যাত ছিলেন তাঁদের অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য। রানি হাটশেপসুট কিন্তু মিশরের ইতিহাসে বিখ্যাত অন্য কারণে। হাটশেপসুটই একমাত্র রানি, যিনি একটানা প্রায় পঁচিশ বছর ফ্যারাও হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মিশরের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন।

'বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহিলাকে মিশরের সিংহাসনে বসতে হয়েছে, সাধারণত তাঁদের সিংহাসনে বসতে হয়েছিল নানা সংকটের কারণে। যেমন, হঠাৎ ফ্যারাওয়ের মৃত্যু বা তাঁর উত্তরাধিকারী না থাকা ইত্যাদি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই হাটশেপসুটের মতো স্থায়ীভাবে ফ্যারাওয়ের সিংহাসনে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। কয়েক বছর আনুষ্ঠানিকভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করার পর তাঁদের দায়িত্ব তুলে দিতে হয়েছে অন্যের হাতে। তাঁরা শাসনকার্য পরিচালনা করলেও কেউই কিন্তু নিজেদের ফ্যারাও হিসেবে ঘোষণা করেননি। তাঁরা মূলত রানি হিসেবেই থেকে গিয়েছিলেন। ব্যতিক্রম শুধু হাটশেপসুট, যিনি নিজেকে ফ্যারাও হিসেবে ঘোষণা করেন এবং দক্ষতার সঙ্গে আমৃত্যু শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

'মিশরের প্রথম মহিলাশাসকের নাম সেবেকনেফ্রু। তিনি ছিলেন

BanglaBook.org

ফ্যারাও চতুর্থ আমনক্রমহেটের স্ত্রী। তাঁর মৃত্যুর পর ১৭৮৭ থেকে ১৭৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ মাত্র চার বছর রানি হিসেবে মিশরের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তবে তিনি মূলত পুরোহিতদের নির্দেশেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। হাটশেপসুট ছিলেন ফ্যারাও প্রথম টুথমোসিসের মেয়ে। একথা আমি আপনাদের আগে বলেছি। সেকালের প্রথা অনুযায়ী হাটশেপসুটের বিয়ে হয় তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই প্রথম টুথমোসিসের ছেলে দ্বিতীয় টুথমোসিসের সঙ্গে। প্রথম টুথমোসিসের মৃত্যুর পর ফ্যারাও হন দ্বিতীয় টুথমোসিস, আর প্রধান রানি হন হাটশেপসুট। ১৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন দ্বিতীয় টুথমোসিসের মৃত্যু হয়, তখন তাঁর আর এক রানির সন্তান, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তৃতীয় টুথমোসিস ছিলেন শিশু। হাটশেপসুটের কোনো ছেলে ছিল না। তাঁর ছিল একটিমাত্র মেয়ে, নাম নেফ্রুর। সেও তখন ছিল নাবালিকা। এরকম অবস্থায় মিশরের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন হাটশেপসুট। কিন্তু তাঁর এই দায়িত্ব গ্রহণ ছিল তৃতীয় টুথমোসিসের প্রতিনিধি হিসেবে। কার্নাক মন্দিরের গায়ে এক চিত্রলিপিতে এর সপক্ষে প্রমাণও মিলেছে। সেই ছবিতে দেখা যায়, প্রথমে রাজছত্র মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন তৃতীয় টুথমোসিস আর তাঁর এক-পা পিছনে রানির মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছেন হাটশেপসুট। এই ছবি থেকেই বোঝা যায় প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ছিলেন নাবালক ফ্যারাওয়ের প্রতিনিধি।

'কিন্তু দু-বছর শাসনকার্য এভাবে পরিচালনার পর ১৪৭৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সূর্যদেব আমনরার উৎসবের দিনে সমবেত জনতার সামনে হঠাৎই হাটশেপসুট নিজেকে ফ্যারাও হিসেবে ঘোষণা করেন। এবং তার সঙ্গেসঙ্গে নিজেকে ঘোষণা করেন আপার ইজিপ্ট ও লোয়ার ইজিপ্টের অধীশ্বর হিসেবে। আমি কী বলছি তা লক্ষ করবেন, অধীশ্বরী নন কিন্তু, অধীশ্বর। অর্থাৎ একই সঙ্গে তিনি নিজেকে পুরুষ হিসেবেও চিহ্নিত করেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একজন মহিলাকে কেউ ফ্যারাও বলে মেনে নেবে না। তাই তাঁর এই ঘোষণা। তিনি বলেন যে, তিনি আসলে আমনরার সন্তান এবং তিনি পুরুষ। এর পর তাঁর সাজপোশাকও পালটে যায়। ফ্যারাওদের অর্থাৎ পুরুষদের মতো পোশাক পরতে শুরু করেন তিনি। এমনকী, ফ্যারাওদের মতো নকল লম্বা দাড়িও

BanglaBook.org

পরতে থাকেন। যে কারণে কার্নাক মন্দিরে বা মরচুয়ারি মন্দিরে তাঁর যেসব ছবি বা মূর্তি দেখা যায়, তা দেখে প্রাথমিক অবস্থায় সকলেই তাঁকে পুরুষ বলে ভুল করে।

'এ তো গেল হাটশেপসুটের সিংহাসনে বসার গল্প। কিন্তু শাসক হিসেবেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। আশপাশের রাজ্যগুলোর সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করেন ও ব্যাবসাবাণিজ্যের উন্নতিসাধন করেন। ইথিওপিয়ায় তাঁর বাণিজ্যতরী বাণিজ্য করতে যেত। সোনা ও সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুদানে এক সামরিক অভিযানও করেন তিনি। তবে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল, নিজের মরচুয়ারি মন্দির তৈরি, যা দেখে আজও আমাদের বিস্মিত হতে হয়।'

তন্ময় হয়ে ডা. নাসেরের কথা শুনছিলাম। হঠাৎ অংশু বলল, 'আমরা কি পাহাড়ে উঠছি?'

বাইরে তাকিয়ে দেখি, সত্যিই এক রুক্ষ পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করেছি আমরা। চারদিকে কোনো সবুজের চিহ্ন নেই। সর্বত্র শুধু হলদেটে রঙের পাথরের স্তূপ। তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা ক্রমশ উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। গাড়ির গতি ধীর হয়ে আসতে লাগল। পাকদণ্ডীর কোনো কোনো বাঁক বেশ সংকীর্ণ। একটু এদিক-ওদিক হলে নীচে আছড়ে পড়তে হবে। যত আমরা উপরে উঠছি ততই যেন পাল্লা দিয়ে রোদের তেজ বাড়ছে। গাড়ির মধ্যে ঘেমে উঠতে লাগলাম আমরা। বেশ খানিকটা উপরে ওঠার পর একটা পাথুরে টিলায় চোখে পড়ল একটা ছোট্ট বাড়ি।

সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডা. নাসের বললেন, 'ওটা হল হাওয়ার্ড কার্টারের বাড়ি, যিনি তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কার করেন। ওই বাড়িতেই থাকতেন তিনি।'

একসময় আমরা উঠে এলাম পাহাড়ের উপর এক চত্বরে। বেশ কয়েকটা রাস্তা বেরিয়েছে সেখান থেকে। ঢালু হয়ে তারা আবার পাথুরে দেওয়ালের গা ঘেঁষে নীচের দিকে অদৃশ্য হয়েছে। চত্বরের এক পাশে বিরাট এক সাইনবোর্ডে একটা ম্যাপ আঁকা আছে। আর ম্যাপের মাথার উপর ইংরেজিতে বড়ো বড়ো হরফে লেখা আছে, 'ওয়েলকাম টু ভ্যালি অফ কিংস'। বুঝতে পারলাম, আমরা এসে গিয়েছি ফ্যারাওদের সেই প্রাচীন সমাধিস্থানে।

BanglaBook.org

ডা. নাসের বললেন, 'আমরা কিন্তু এখানে এখন থামব না।' তারপর একটু দূরে এক উপত্যকার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'ওটা হল, 'ভ্যালি অব কুইনস'। এর মধ্যে দূরত্ব তিন কিলোমিটার। এই ভ্যালি অব কিংসের পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে রয়েছে ফ্যারাওদের অসংখ্য টুম বা সমাধি। এই ফ্যারাওরা প্রত্যেকেই ১৫৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ মধ্যবর্তী সময়ে মিশরের সিংহাসনে বসে ছিলেন। তবে তাঁদের সমাধিগুলোয় কিছুই আর অবশিষ্ট নেই বললেই চলে। যুগ যুগ ধরে চোরের দল লুণ্ঠন করে নিয়েছে সমাধির মধ্যে রাখা ফ্যারাওদের অতুলনীয় সম্পদ। আর তাঁদের মমিগুলো অধিকাংশই এখন রাখা আছে কায়রো মিউজিয়ামে। তুতানখামেনের মমি অবশ্য এখনও এখানেই আছে। এ প্রসঙ্গে আপনাদের একটা কথা বলি। যেহেতু রানি হাটশেপসুট নিজেকে ফ্যারাও এবং পুরুষ বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাই তাঁর মমি প্রাথমিক অবস্থায় ভ্যালি অফ কুইনসের বদলে এখানেই রাখা হয়। পরবর্তীকালে নাকি তাঁর মমি এখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নুবিয়ান মরুভূমিতে পুঁতে ফেলা হয়। সম্ভবত এ কাজ হয় ফ্যারাও তৃতীয় টুথমোসিসের নির্দেশে। তিনি মিশরের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন হাটশেপসুটের নাম।'

ডা. ঘটক জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

ডা. নাসের বললেন, 'প্রথমত, হাটশেপসুটের জন্য তাঁর সিংহাসনে বসা বিলম্বিত হয়েছিল। ফলে তাঁর প্রতি তৃতীয় টুথমোসিসের একটা স্বাভাবিক আক্রোশ ছিল। দ্বিতীয়ত, পুরুষতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একজন মহিলাকে ফ্যারাওয়ের মর্যাদা দিতে কেউ চাননি। শুধু তৃতীয় টুথমোসিসই নন, তাঁর পরবর্তীকালে কোনো রাজাই তাঁকে ফ্যারাও হিসেবে চিহ্নিত করতে চাননি। অথচ হাটশেপসুট বিদ্যা, বুদ্ধি, রাজ্যশাসনের ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না।'

ডা. নাসেরের কথা শুনতে শুনতে আমরা উপত্যকার ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলাম। বেশ কিছুটা নীচে নামার পর আবার উপরে ওঠার পালা। এবড়োখেবড়ো রাস্তা বলে গাড়িও চলছে খুব ধীর গতিতে। ভ্যালি অফ কিংস থেকে নীচে নেমে ভ্যালি অফ কুইনসের গা বেয়ে চলতে লাগলাম আমরা। রাস্তার পাশে পাহাড়ের গায়ে হঠাৎ চোখে পড়ল একটা গুহামুখ।

BanglaBook.org

তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন স্থানীয় মানুষ। সাদা চামড়ার পর্যটকদের কয়েকটা গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। একটা সাইনবোর্ডও টাঙানো রয়েছে গুহামুখের মাথায়। কিন্তু তাতে এত ছোটো হরফে লেখা আছে যে, চলন্ত গাড়ি থেকে তা পড়া সম্ভব নয়। আমাদের গাড়ি গুহার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বেশ কয়েকজন স্থানীয় মানুষ গাড়ির দিকে এগিয়ে এল। ডা. নাসের হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমরা এখানে থামব না। এর পর তিনি আমাদের উদ্দেশে বললেন, 'এটা হল রানি নেফারতিতির সমাধিতে ঢোকার পথ। যে লোকগুলো গাড়ি থামাবার চেষ্টা করেছিল তারা হল গাইড। নেফারতিতির গুহায় বেশ কিছু সুন্দর চিত্রলিপি আছে। তবে গুহার শেষ প্রান্তে যেখানে রানির সমাধিকক্ষ আছে, সে পর্যন্ত কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। কারণ, সরকারি নিষেধাজ্ঞা আছে।'

নেফারতিতির গুহা ছাড়িয়ে আরও একটু এগোবার পর আমরা হাজির হলাম আরও রুক্ষ এক অঞ্চলে। রাস্তার দু-পাশে শুধু বিরাট বিরাট পাথরের স্তূপ আর দিগন্ত বিস্তৃত বালিয়াড়ি। সূর্যকিরণে তারা যেন দাউদাউ করে জ্বলছে। চারদিকে কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। সম্পূর্ণ অচেনা এ জগৎ! দেখে মনের মধ্যে কেমন যেন ভয় করে। কাউকে যদি এখানে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার মৃত্যু একদম নিশ্চিত। অংশু আর ডা. ঘটককেও দেখলাম, চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে। মনে মনে এ জায়গার একটা নামকরণ করে ফেললাম আমি, 'দ্য ভ্যালি অফ ডেথ' বা 'মৃত্যুউপত্যকা'।

আমার মনের ভাব পাঠ করেই কি না জানি না, ডা. নাসের হঠাৎ বললেন, 'এই রুক্ষ-শুষ্ক প্রান্তরেও কিন্তু প্রাণের স্পন্দন আছে। শিয়াল ও বেশ কয়েক ধরনের ছোটোখাটো মাংসাশী প্রাণী আছে এখানে, আর আছে স্যান্ড ভাইপার সহ বেশ কয়েক ধরনের বিষধর সাপ! দিনের বেলায় রোদের প্রচণ্ড তাপ থেকে বাঁচতে তারা লুকিয়ে থাকে পাথরের ফাটলে অথবা বালির নীচের গর্তে। রাত হলেই তারা বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর সারা রাত ধরে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে বয়ে চলে তাদের জীবনমৃত্যুর খেলা। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গেসঙ্গেই আবার তারা লুকিয়ে পড়ে নিজেদের আস্তানায়।'

আমাদের গাড়ি একসময় লম্বা বাঁক নিল, আর তখনই চোখে পড়ল

BanglaBook.org

কিছু দূরে এক পাহাড়ের ঢালের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক প্রাচীন স্থাপত্য। তার বিরাট বিরাট সাদা থামগুলো দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মিনিট খানেকের মধ্যে গাড়ি এসে থামল সেই পাহাড়ের ঢালে এক চত্বরে। ডা. নাসেরই প্রথম নামলেন গাড়ি থেকে। তারপর নামলাম আমরা। বাইরে প্রচণ্ড রোদ থাকলেও গাড়ির ভিতরের গুমোট ভাব থেকে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। ডা. নাসের বললেন, 'আমাদের ব্যাগগুলো সব নামিয়ে ফেলতে হবে। গাড়ি আর যাবে না, বাকি পথটা আমাদের হেঁটেই উঠতে হবে।'

ব্যাগ, জলের বোতল ইত্যাদি গাড়ি থেকে নামিয়ে ফেললাম আমি। কিছু দূরে বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে পাশাপাশি রাখা দুটো ধুলোমাখা জিপগাড়ি দেখে আমি চিনতে পারলাম। সে দুটোকে আমি গতকাল সন্ধ্যের সময় হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। নিশ্চয়ই ওগুলো ড. হান্সের। পাহাড়ের উপর ওঠার জন্য যেখান থেকে সিঁড়ি শুরু হয়েছে, সেখানে একটা লোহার গেট আছে। তার পাশে একটা টিকিট কাউন্টার। আমি টিকিট কাউন্টারের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ডা. নাসের বললেন, তার দরকার হবে না। কারণ, মরচুয়ারি মন্দিরে যাওয়া ও এই অঞ্চলে থাকার জন্য তিনি বিশেষ অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে এনেছেন কায়রোর সরকারি দপ্তর থেকে।

BanglaBook.org

ডা. নাসের ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন তার গাড়িটা নিয়ে পাহাড়ের উলটো দিকে অর্থাৎ মরচুয়ারির পিছন দিকে চলে যায়। ওখানে বেশ কিছু তাঁবু ফেলা আছে। তার কাছাকাছি যেন সে গাড়ি পার্ক করে। সেখানেই তার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। আমরা আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম উপরে ওঠার সিঁড়ির মুখে। ডা. নাসের তাঁর সেই অনুমতিপত্রটা উপরে ওঠার গেটের মুখে টিকিট পরীক্ষককে দেখাতেই সে সম্ভ্রমে গেট খুলে দিল। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলাম আমরা। সকলের আগে উঠতে লাগল অংশু।

৯

আমরা উঠে এলাম বিরাট এক পাথুরে চত্বরে। তারপর বেশ কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম সামনের দিকে। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে

আছে রানি হাটশেপসুটের বিশাল মরচুয়ারি মন্দির। তার একতলা ও দোতলার বিরাট বিরাট পাথরের স্তম্ভগুলো কিছুটা ক্ষয়ে গেলেও এখনও প্রাচীন মিশরীয় শিল্পরীতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। জনহীন রুক্ষ প্রান্তরে সে একাকী দাঁড়িয়ে আছে আপন গাম্ভীর্য নিয়ে। সেই কোন সুদূর অতীত সভ্যতার বিকাশ যখন সবে শুরু হয়েছে, তখন রানি হাটশেপসুট তৈরি করেছিলেন এই মন্দির। তারপর অনেক রাজবংশের উত্থানপতন হয়েছে, নীলনদ দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। সেসব কিছুর সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে এই মন্দির। হয়তো হাজার বছর পরেও দাঁড়িয়ে থাকবে, স্মরণ করাবে রানি হাটশেপসুটকে।

আমরা উপরে ওঠার পর আমাদের দেখে ঢিলে পোশাকপরা কয়েকজন লোক ছুটে এল। বুঝতে পারলাম, তারা নিশ্চয়ই গাইড। তারা কাছে আসতেই ডা. নাসের আরবি ভাষায় কী যেন বললেন। তা শুনে লোকগুলো বিমর্ষভাবে ফিরে গেল। ডা. নাসের বললেন, 'যেসব মিশর গবেষকরা এসব জায়গায় কাজ করতে আসেন তাঁদের কিন্তু এইসব গাইড একদম পছন্দ

BanglaBook.org

করে না। কারণ, অধিকাংশ সময়েই এরা সাধারণ পর্যটকদের ভুলেভরা অথবা মনগড়া তথ্য পরিবেশন করে। কিন্তু গবেষকরা সবসময় তথ্যপ্রমাণ খোঁজার চেষ্টা করেন। যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিশ্লেষণ করেন। তাই আমি গবেষক পরিচয় দিতে ওরা বেজার মুখে চলে গেল। তা ছাড়া নতুন কোনো খননকার্য চলার সময় সেই অঞ্চলে সাধারণ মানুষের বা পর্যটকদের ঢোকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। তাতে অনেক সময় পেটে টান পড়ে গাইডদের । গবেষক বা পুরাতত্ত্ববিদদের তারা এইজন্যেও অপছন্দ করে। ভাবে, এই বুঝি তারা এসে আবার খোঁড়াখুড়ি শুরু করল।'

ডা. নাসের মনে হয় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই কানে এল, 'হাই ডা. নাসের!'

তাকিয়ে দেখলাম, ড. হান্স এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। কাল হোটেলে তাঁকে দেখেছিলাম কোট-প্যান্টে, কিন্তু আজ তাঁর একেবারে অন্য পোশাক! পরনে খাকি রঙের শার্ট-প্যান্ট, কোমরে চওড়া বেল্ট, হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢাকা জুতো, মাথায় শোলার টুপি। কাছে এসে তিনি টুপি খুলে আমাদের তিন জনের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর অংশুর দিকে টুপিটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এখানে প্রচণ্ড রোদ, এটা তুমি নাও।'

সেটা নেওয়া উচিত হবে কি না তা বুঝতে না পেরে অংশু তাকাল আমার দিকে। তাকে ইতস্তত করতে দেখে ডা. হান্স এবার টুপিটা নিজেই তার মাথায় পরিয়ে দিলেন। তারপর আমাদের উদ্দেশে বললেন, 'চলুন, আগে একটু বিশ্রাম নিন। মরচুয়ারি দেখার জন্য তো সারাদিন রয়েছে। তা ছাড়া আমার কাজের জায়গাটাও তার আগে আমি আপনাদের দেখাব।'

আমরা চত্বর পেরিয়ে মরচুয়ারি মন্দিরের গা ঘেঁষে তাঁর পিছুপিছু চলতে শুরু করলাম। চারপাশে ছড়িয়ে আছে নানাধরনের শিল্পকলা, বিশেষত নানাধরনের প্রাচীন মিশরীয় দেবদেবীর মূর্তি আর ফ্যারাওদের মূর্তি। যদিও তার মধ্যে বেশ কিছু মূর্তি আজ আর অক্ষত অবস্থায় নেই। তবে মরচুয়ারির দেওয়ালের গায়ে সার সার ফ্যারাওদের মূর্তিগুলো কিন্তু অক্ষত অবস্থায় আছে। ডা. নাসের আমাকে ওই ফ্যারাও মূর্তিগুলো দেখিয়ে বললেন যে, সেগুলো আসলে রানি হাটশেপসুটের মূর্তি।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মন্দির বাঁ-পাশে রেখে চক্রাকার পথে চলতে চলতে আমরা এসে হাজির হলাম মন্দিরের পিছন দিকে। তারপর আবার ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করলাম। যে পথ বেয়ে আমরা নীচের দিকে নামছি, তার পাশে প্রায় ভাঙা একটা পাথরের উঁচু প্রাচীর আছে। তাই রোদটা সরাসরি গায়ে লাগছিল না। বেশ একটা ছায়া ছায়া ভাব জায়গাটায়। প্রায় দেড়শো ফুট নীচে নামার পর আমরা এসে দাঁড়ালাম মরচুয়ারি মন্দিরের ঠিক নীচে পাহাড়ের ঢালে, কিছুটা সমতল জায়গায়। আরও অনেকটা নীচে একটা চওড়া জায়গায় চোখে পড়ল সার সার তাঁবু। বুঝতে পারলাম, ওখানেই রাতে থাকব আমরা। যেখানে আমরা এসে দাঁড়ালাম, সে জায়গায় কোদাল-বেলচার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার ঠিক সামনেই পাহাড়ের ঢালে একটা সুড়ঙ্গো ঢোকার পথ। জনা কুড়ি লোক কাজ করছে সেখানে। জায়গাটার চারপাশে ছোটো ছোটো পাথরের টুকরো রাখা আছে। সুড়ঙ্গোর ভিতর থেকে মাথায় ঝুড়ি করে পাথরের টুকরো বাইরে এনে ফেলছে শ্রমিকের দল। সুড়ঙ্গো ঢোকার পথের একটু দূরে কীভাবে যেন গোটা তিনেক খেজুর গাছ জন্মেছে। অনেকক্ষণ পর এই শুষ্ক মরুময়

পাথুরে অঞ্চলে গাছগুলো দেখে ভারি ভালো লাগল। গাছগুলোর নীচে একটা বড়ো তাঁবু খাটানো আছে। তার নীচে বসে আছে দু-জন শ্বেতাঙ্গ ও এক জন বিশালদেহী আফ্রিকান। তার কাঁধে একটা রাইফেল। আমাদের দেখতে পেয়েই তারা উঠে দাঁড়াল।

ড. হান্স সুড়ঙ্গের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'ওটা আমিই আবিষ্কার করেছি। এখনও শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারিনি, ভিতরে কাজ চলছে। কিছুক্ষণ পর আমি আপনাদের ওর ভিতরে নিয়ে যাব।'

সুড়ঙ্গের কাছ দিয়ে আমরা এসে দাঁড়ালাম তাঁবুর সামনে। ড. হান্স তিন জনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্বেতাঙ্গ দু-জনের নাম কার্ল এবং পাউল। ড. হান্সের এই দু-জন সহকারীও জার্মান। আর কৃষ্ণাঙ্গ লোকটির নাম ঘালি। আসলে সে কেনিয়ার লোক। কিন্তু বছর কুড়ি ধরে সে মিশরে আছে। এখানকার এক সিকিউরিটি এজেন্সিতে চাকরি করে। কাজের তাগিদে পর্যটক বা গবেষকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সে। ড. হান্সের মুখে শুনলাম, তাঁর আর একজন জার্মান সঙ্গী আছে, নাম হাইমুট। সে সুড়ঙ্গের ভিতর খননকার্যের তদারকি করছে। তাঁবুর নীচে একটা ক্যাম্পখাট পাতা। তার উপর বসলাম আমরা। তাঁবুর এক কোনায় বেশ কিছু জিনিসপত্র রাখা। আমরা তাঁবুতে বসবার পর ডা. হান্সের সহকারী কার্ল সেখান থেকে কফির পাত্র এনে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। আর তার সঙ্গে দিলেন রুটির মতো দেখতে একধরনের খাবার। মুখে দিয়ে দেখলাম, খাবারটা বেশ সুস্বাদু। অংশু কফি খেল না। কিন্তু মনে হয় খিদে পেয়েছিল। কারণ, পাত্রে রাখা বাড়তি রুটিটা সে হাতে তুলে নিল। সেটা খাবার পর আমার কাছ থেকে জলের বোতল নিয়ে ঢকঢক করে বেশ অনেকটা জল খেল।

ড. হান্স বললেন, 'আশা করি এ অঞ্চলে রাত কাটাতে আপনাদের খুব একটা মন্দ লাগবে না। এখানে দিনের বেলা খুব গরম, কিন্তু সূর্য ডোবার পরেই ঠান্ডা নামতে শুরু করে। তখন খুব আরাম।'

ডা. নাসের বললেন, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমি জানি। একসময় আমি এ অঞ্চলে অনেক রাত কাটিয়েছি। তখন অবশ্য আমার মাথায় এত বড়ো টাক ছিল না।'

তাঁর কথা শুনে ড. হান্স সহ আমরা সকলে হেসে উঠলাম। ড. হান্স

BanglaBook.org

এরপর ডা. নাসেরের উদ্দেশে বললেন, 'আপনি এখানে আসায় আমি হয়তো উপকৃত হব। কারণ, আমি জানি আমার চেয়ে আপনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।'

ডা. নাসের তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি নিশ্চয়ই খুশি হব। তবে আমি কিন্তু পণ্ডিত নই। আপনার মতো এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও আমার নেই। আমার পেশা ডাক্তারি। মিশরের ইতিহাস ছেলেবেলা থেকেই আমাকে আকর্ষণ করে। তাই সময় সুযোগ পেলে এ ব্যাপারে একটু জানার চেষ্টা করি মাত্র। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

অংশু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল খানিক দূরে একটা পাথরের কাছে।

ডা. ঘটক এতক্ষণ আমার মতোই চুপচাপ বসে ড. হান্স আর ডা. নাসেরের কথাবার্তা শুনছিলেন। এবার তিনি ড. হান্সের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এখানে কীসের অনুসন্ধান করছেন? কোনো ফ্যারাওয়ের মমির?'

ড. হান্স বললেন, 'না। ফ্যারাওদের সমাধি দেওয়া হত ওই দূরের ভ্যালি অফ কিংসে। আমি অনুসন্ধান করছি অন্য এক মমির। সে কোনো ফ্যারাও বা ক্ষমতাবান লোক ছিল না। কিন্তু নিয়তি তাকে জড়িয়ে দিয়েছিল রানির মরচুয়ারি মন্দিরের সঙ্গে। যদিও তার ব্যাপারটা আদপে সত্যি না-ও হতে পারে। কারণ, খুব সামান্য সূত্র ধরে আমি কাজ শুরু করেছি। জানি না শেষ পর্যন্ত আমি সফল হতে পারব কি না!'

ডা. নাসের তাঁর কথা শুনে বললেন, 'কার্টারও কিন্তু খুব সামান্য সূত্রের উপর ভিত্তি করে খুঁজে বের করেছিলেন তুতানখামেনের সমাধি। এরকম আরও অনেক উদাহরণ আমার জানা আছে। আশা করি আপনিও সফল হবেন। কিন্তু আপনি কার সমাধি খুঁজছেন?'

ড. হান্স উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই একটা আর্ত চিৎকার আমাদের কানে এল। চমকে আমরা তাকালাম সেই পাথরটার দিকে, যার দিকে গিয়েছে অংশু। ডা. ঘটকের ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল ঘালি। চিৎকার শোনামাত্র সে বিদ্যুৎগতিতে ছুটল পাথরটার দিকে। আর তার পিছনে ছুটলাম আমরা সকলে। পাথরটা বেশ বড়ো। তার পিছনে গিয়ে দেখি, অংশু মাটির

BanglaBook.org

উপর পড়ে আছে। তার শরীর থরথর করে কাঁপছে, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ঘালি তাকে মাটির উপর থেকে সঙ্গোসঙ্গো কোলে তুলে নিল। যেখানে অংশু পড়ে ছিল, সে জায়গাটা ছোটো ছোটো পাথরে ভরতি। তার হাত পঁচিশেক দূরে রয়েছে একটা গভীর খাদ। কোনো লোকজন নেই সেখানে।

ডা. ঘটক অংশুকে দেখে বললেন, 'মনে হচ্ছে হঠাৎ ও ভয় পেয়েছে কোনো কারণে।'

ডা. নাসেরও একই মত জানালেন। কাঁধে ঝোলানো জলের বোতল থেকে জল নিয়ে তিনি ছেটাতে লাগলেন অংশুর মুখে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ধীরে ধীরে কিছুটা স্বাভাবিক হল। যদিও তার মুখে-চোখে তখনও ভয়ের রেশ লেগে আছে। ঘালির কোল থেকে নীচে নেমে দাঁড়াল সে, তারপর ডা. ঘটকের কোমর জড়িয়ে ধরল। ডা. ঘটক সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'অংশু, তুমি কি ভয় পেয়েছ?'

অংশু মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।'

ডা. ঘটক বললেন, 'তোমার কোনো ভয় নেই, আমরা সকলেই তো তোমার সঙ্গো আছি। কিন্তু কেন ভয় পেলে তুমি?'

অংশু এবার ভয় ভয় চোখে আঙুল তুলে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। জায়গাটা একদম খাদের ধারে। ফণিমনসা জাতীয় গাছের একটা বড়ো ঝোপ রয়েছে সেখানে। দেখলাম, তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আছে একটা আনুবিসের মাথা। বুঝতে পারলাম, ওটা হঠাৎ দেখে ভয় পেয়েছে অংশু। আনুবিসের মাথাটা কুচকুচে কালো, মনে হয় শ্লেট পাথরে তৈরি। অন্য সকলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। ডা. নাসের অংশুর উদ্দেশে বললেন, 'ওটা তো একটা মূর্তি! কায়রো মিউজিয়ামে আগেও তুমি ওই মূর্তি দেখেছ, কার্নাক মন্দিরেও হয়তো দেখেছ। তাহলে ভয় পেলে কেন?'

অংশু আবার বিড়বিড় করে বাংলায় বলল, 'ওটা নড়ছিল, আমি চিনতে পেরেছি ওকে।'

সে কী বলল বুঝতে না পেরে ডা. নাসের আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে বললাম অংশু কী বলল। তিনি এরপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন মূর্তিটার দিকে। তারপর মূর্তির মাথায় হাত রেখে চিৎকার করে

BanglaBook.org

অংশুর উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই দেখো, আমি ওর মাথায় হাত রাখলাম। এটা একটা পাথরের মূর্তি। তুমি কাছে এসে দেখে যাও।'

অংশু কিন্তু গেল না। আমি শুনতে পেলাম সে বিড়বিড় করে বলল, 'আমি ঠিক চিনতে পেরেছি ওকে। কাল রাতেও আমি ওকে ঘুমের মধ্যে দেখেছি।'

অংশুর কথাটা মনে হয় ডা. ঘটকেরও কানে গেল। তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমার মনে পড়ে গেল কায়রোর প্যাপাইরাসের দোকানে আনুবিসের ফোটো দেখেও একই কথা বলেছিল অংশু। আর বুঝতে পারলাম, এত ঘন ঘন যখন সে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে, তখন তার সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটতে আর বেশি দেরি নেই। হয়তো আজ বা কালই সেটা ঘটবে।

অংশু মূর্তিটার কাছে না যাওয়ায় ডা. নাসের ফিরে এলেন আমাদের কাছে। আমরা তাঁবুতে গিয়ে মিনিট দশেক বসলাম। অংশু আরও কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর ডা. হান্স একটু ইতস্তত করে বললেন, 'এবার আপনাদের যদি অসুবিধে না হয় তাহলে সুড়ঙ্গের ভিতরটা দেখিয়ে আনতে পারি। তবে ভিতরে অক্সিজেনের পরিমাণ একটু কম, ছোটো ছেলেটির একটু কষ্ট হতে পারে।'

তাঁর কথা শুনে ডা. ঘটক বললেন, 'অংশুকে এই মুহূর্তে ভিতরে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ও আবার কোনো কারণে ভয় পেলে বিপত্তি ঘটতে পারে। আপনি বরং ডা. নাসের আর আমার তরুণ বন্ধুকে নিয়ে ভিতরে যান। আমি অংশুকে নিয়ে এখানেই বসি।'

ডা. ঘটক ও অংশুকে রেখে সুড়ঙ্গের ভিতরে যেতে ইচ্ছে না করলেও শেষ পর্যন্ত ডা. নাসেরের অনুরোধে ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে আমিও তাঁর পিছনে পা বাড়ালাম।

প্রথমে ড. হান্স তারপর ডা. নাসের ও সবশেষে আমি, এইভাবে আমরা ঢুকলাম সুড়ঙ্গের ভিতর। অন্যরা তাঁবুতেই রয়ে গেলেন। সুড়ঙ্গের ভিতর দু-জনে পাশাপাশি হাঁটা যায়। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় মাথার উপর মসৃণ ছাদ। সুড়ঙ্গ প্রথমে ঢালু হয়ে তারপর আবার উপর দিকে উঠেছে। দেওয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে আলো বসিয়ে অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোগুলো হয়তো ব্যাটারি দিয়ে জ্বালানো হয়। বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর আমরা এসে

BanglaBook.org

দাঁড়ালাম একটা হলঘরে। তার সারা দেওয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে নানাধরনের ছবি। সে ঘর থেকে আবার বেশ কয়েকটা সুড়ঙ্গ নানাদিকে বেরিয়ে গিয়েছে। তারই একটা ধরে আরও কিছুক্ষণ উপর দিকে এগোবার পর আমরা হাজির হলাম আর একটা হলঘরে। ঘরটা সার্চলাইটের আলোয় আলোকিত। ঘরের এক কোনায় একটা পাথরের দেওয়ালের উপর গাঁইতি চালাচ্ছে শ্রমিকের দল। পাথরের উপর লোহার ফলকের আঘাতে আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরোচ্ছে। একজন শ্বেতাঙ্গ তাদের কাজের তদারকি করছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন। ড. হান্স তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি ড. হান্সের সহযোগী, নাম হাইমুট। এ ঘরের দেওয়ালও নানাধরনের চিত্রলিপিতে সাজানো।

ড. হান্স বললেন, 'আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, বলা যেতে পারে এটা হাটশেপসুটের মরচুয়ারি মন্দিরের ঠিক নীচে অবস্থিত।'

ডা. নাসের এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। তিনি এবার প্রশ্ন করলেন, 'ড. হান্স, এই সুড়ঙ্গের সন্ধান আপনি পেলেন কীভাবে?'

হান্স বললেন, 'ফ্রান্সের লুভর মিউজিয়ামে রাখা এক শিলালিপি থেকে।'

ডা. নাসের আবার প্রশ্ন করলেন, 'কী লেখা আছে তাতে?'

'লেখা আছে এক হতভাগ্য বালকের কথা, হাটশেপসুটের মন্দিরের নীচে যাকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল।'

BanglaBook.org

আমার মনে হল, তাঁর কথা শুনে ডা. নাসের যেন একটু চমকে উঠলেন। তিনি যেন আর একটা কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ড. হান্স চাপা স্বরে বললেন, 'এ ব্যাপারে আর এখানে আলোচনা করা ঠিক হবে না। যেসব শ্রমিক এখানে কাজ করছে এরা ইংরেজি বোঝে। অনেক সময় এরা সমাধি-চোরদের কাছে পয়সার লোভে খবর পৌঁছে দেয়। সমাধিতে পৌঁছে দেখা যায় গবেষকদের আগেই সেখানে হানা দিয়ে সব কিছু নিয়ে গিয়েছে চোরের দল।'

তাঁর কথা শুনে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না ডা. নাসের। তিনি এর পর ঘরের দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে একটা জায়গায় বেশ অনেকক্ষণ দাঁড়ালেন তিনি। খুব মনোযোগ দিয়ে চেয়ে রইলেন মাটি থেকে একটু উপরে আঁকা একটা ছবির

দিকে। তারপর ড. হান্সের উদ্দেশ্যে বললেন, 'সম্ভবত ঠিক পথেই চলেছেন আপনি! শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে আমি আর আপনি একই জিনিস খুঁজতে এখানে এসেছি।'

ড. হান্স তাঁর কথাটা বুঝতে না পেরে ডা. নাসেরের মুখের দিকে তাকালেন। ডা. নাসের কিন্তু আর কোনো কথা বললেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সেখান থেকে বাইরে বের হওয়ার জন্য পা বাড়ালাম।

১০

সুড়ঙ্গ থেকে বাইরে এসেই সূর্যের আলোয় চোখ ঝলসে গেল। বেশ কয়েকটা মুহূর্ত লাগল ভালো করে তাকাতে। সূর্য এখন ঠিক মাথার উপর। তাঁবুর সামনে এসে দেখি, নীচ থেকে খাবার চলে এসেছে। নীচে যেখানে ড. হান্সদের তাঁবুগুলো রয়েছে, অংশু সেদিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। দেখলাম আমাদের ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছে সেখানে। তাকে দেখেই হাত নাড়ল অংশু। আমরা এর পর খেতে বসলাম। খাবার বলতে হাতে-বানানো মোটা রুটি আর ভেড়ার মাংসের ঝোল। খেতে কিন্তু মন্দ লাগল না। অংশু বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেল। ড. হান্স আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন। শুনলাম, অন্যরা নাকি একটু পরে নীচে তাঁবুতে গিয়ে খাবেন।

BanglaBook.org

খাবার পর একটা চামড়ার ব্যাগ থেকে তামাক বের করে তাঁবুতে বসে বেশ কিছুক্ষণ ধূমপান করলেন ড. হান্স। তাঁর ধূমপান করার সময় অংশু হঠাৎ বলল, 'সিগারেট স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ।'

ডা. হান্স হেসে উঠলেন তার কথা শুনে। তারপর অংশুর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, এটা খুবই বাজে নেশা। আমি এর পর থেকে এটা ছাড়ার চেষ্টা করব।' ধূমপান শেষ করার পর ডা. হান্স বললেন, 'চলুন, এবার আপনাদের মরচুয়ারি মন্দির দেখিয়ে আনি। দেখবেন, পর্যটকদের ভিড়ে এখন মন্দিরচত্বর কেমন গমগম করছে।'

যে পথ বেয়ে আমরা নীচে নেমেছিলাম সে পথ দিয়েই আমরা উঠে এলাম মন্দিরচত্বরে। সত্যিই আগের দেখা মন্দিরচত্বর এখন পর্যটকদের ভিড়ে ভরতি। নানা দেশের পোশাকপরা নানা ধরনের মানুষজন। পাথরের ঢালু

পথ বেয়ে আমরা ঢুকলাম মন্দিরের ভিতরে। পাথরের তৈরি বিরাট বিরাট স্তম্ভ ধরে রেখেছে মন্দিরের ছাদ। কয়েক হাজার বছর অতিক্রান্ত হলেও তার কোথাও এখনও একটুও চিড় ধরেনি। সত্যি সত্যি সেসময়ের স্থাপত্যবিদদের শ্রদ্ধা জানাতে হয়। মন্দিরের স্তম্ভ বা দেওয়ালের ছবি বা মূর্তিগুলো সব পাথর কুঁদে তৈরি করা। তার বেশির ভাগই দেবদেবীর মূর্তি। কখনো ডা. নাসের আবার কখনো ড. হান্স আমাকে আর ডা. ঘটককে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন তাঁদের কোনটা আমনরা, কোনটা সূর্যকন্যারা, কোনটা দেবী হ্যাথোর আর কোনটা বা রানি হাটশেপসুটের মূর্তি। আর একটা দেবতার মূর্তি অবশ্য আমাদের চিনিয়ে দিতে হল না। প্রতিটি স্তম্ভ আর দেওয়ালের গায়ে তিনি বিরাজমান। তিনি মৃত্যুর দেবতা, আনুবিস। তিনিই পরলোকের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির যোগসূত্র স্থাপন করতেন। মরচুয়ারি মন্দিরেই মমি তৈরির শেষ কাজ সম্পন্ন করে মৃত ব্যক্তিকে তুলে দেওয়া হত আনুবিসের হাতে। মন্দিরের মধ্যে চারদিকে এত আনুবিসের মূর্তি। তাই একে আনুবিসের মন্দির বললেও খুব একটা ভুল হবে না। ডা. নাসের আমাদের একটা দেওয়ালে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সেখানে ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে কীভাবে মমি তৈরি করা হত। মন্দিরের এক অংশে কালো গ্রানাইটের তৈরি বাথটবের মতো জিনিস রাখা ছিল। তা দেখিয়ে ড. হান্স বললেন, 'ওই পাত্রগুলোর মধ্যে লবণ জলের দ্রবণে মৃতদেহ চুবিয়ে রাখা হত।'

অংশুকে দেখলাম, আগ্রহ নিয়ে সব কিছু দেখছে। কিন্তু লক্ষ করলাম, একবারের জন্যও সে ডা. ঘটকের হাত ছাড়েনি। হয়তো আনুবিসের মতো মূর্তি দেখে তার মনের মধ্যে ভয় কাজ করছে। আমি তার অন্য হাতটা ধরার পর সে ডা. ঘটকের হাত ছাড়ল। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'তোমার কি ভয় করছে অংশু?'

আমার কথার জবাবে একটা অদ্ভুত কথা বলল সে। সে শুধু বলল, 'আমি এসব আগে দেখেছি।'

আমি বললাম, 'কবে?'

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না অংশু। মন্দিরের নীচের অংশ দেখে আমরা ঢালু পথ বেয়ে মন্দিরের দোতলায় বা উপরে উঠে এলাম। দোতলার ছাদও ধরে রেখেছে সার সার স্তম্ভ। দোতলায় দাঁড়িয়ে রুক্ষ মরুপ্রান্তরের

BanglaBook.org

অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। দোতলায় ছড়িয়ে আছে মিশরীয় শিল্পকলার আশ্চর্য সব নিদর্শন। ডা. নাসের আমাদের এনে দাঁড় করালেন এক অদ্ভুত ছবির সামনে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একজনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মৃত্যুর দেবতা আনুবিস। তাঁর সামনে একটা বিরাট দাঁড়িপাল্লা রাখা। আর তার দু-ধারে দুটো পাত্র ওজন করার জন্য বসানো রয়েছে। দাঁড়িপাল্লার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে আছে একজন, তার শরীরের উপরের দিকে কুমিরের মাথা বসানো। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন বাজপাখির মতো মাথাওলা আকাশের দেবতা হোরাস।

ডা. নাসের বললেন, 'এই ছবিতে আত্মার শেষ বিচারের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ছবিতে দেখানো হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে আনুবিস তার শেষ বিচারের জন্য এনেছেন। দাঁড়িপাল্লার একদিকে পাত্রের মধ্যে রাখা হয়েছে তার হৃৎপিণ্ড। অন্য দিকের পাত্রে রাখা হয়েছে তার জীবিত অবস্থায় সঞ্চিত পাপ। পাপের পরিমাণ বেশি হলে তার হৃৎপিণ্ড খাইয়ে দেওয়া হবে কুমিরমুখী দেবতাকে। তার আত্মা অনন্ত নরকবাস করবে। আর পাপের পরিমাণ কম হলে তার আত্মাকে তুলে দেওয়া হবে দেবতা হোরাসের হাতে। আকাশের দেবতা হোরাস আকাশপথে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে নিয়ে পাড়ি দেবেন অনন্তলোকের উদ্দেশে।'

স্তম্ভ আর দেওয়ালের গায়ে ছবিগুলো দেখতে দেখতে ডা. ঘটক হঠাৎ ডা. নাসেরের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, প্রাচীন মিশরীয়রা কি শুধু মানুষের মমি তৈরি করতেন?'

ডা. নাসের বললেন, 'এ ধারণা কিন্তু একদম ভুল। তাঁরা কুকুর, বেবুন, পাখি থেকে শুরু করে সাপ-ব্যাঙেরও মমি তৈরি করতেন। নীলনদের পশ্চিমে অবস্থিত টেরটাইনিস নামের এক সমাধিক্ষেত্রে দু-লক্ষেরও বেশি কুমিরের মমির সন্ধান মিলেছে। এমনকী তাদের ডিমগুলোকে পর্যন্ত পাতলা রেশমের কাপড়ে মুড়ে মমি করে রাখা হয়েছে। লাক্সরের পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এসনা শহরের কাছে সন্ধান মিলেছে মাছের সমাধিক্ষেত্রের। লক্ষ লক্ষ মাছের মমি আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে। প্রাচীন এসনার পুরোহিতরা মাছের মমি তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিলেন।'

BanglaBook.org

আমি খুব আশ্চর্য হলাম ডা. নাসেরের কথা শুনে। তক্ষুনি আমার পকেট ডায়েরিতে নোট করে নিলাম। ঘুরে ঘুরে আমরা মন্দিরের মধ্যে ছড়িয়ে-থাকা আশ্চর্য সুন্দর ভাস্কর্য, চিত্রলিপি ইত্যাদি দেখতে লাগলাম। কখনো ডা. নাসের কখনো বা ড. হান্স আমাকে আর ডা. ঘটককে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন সব কিছু। ঘণ্টা তিনেক পর আমরা মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ডা. নাসের আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগল আপনাদের?'

আমি আর ডা. ঘটক একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'চমৎকার!'

তবে অংশুকে দেখে মনে হল, সে যেন কী একটা ভাবছে। ডা. নাসের আমাদের বললেন, 'আপনাদের মন্দির দেখা কিন্তু এখনও বাকি থেকে গিয়েছে।' তারপর তিনি ড. হান্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি?'

ড. হান্স মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। যদিও সাধারণ পর্যটকদের সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধে হবে না। মন্দিরের সব জায়গায় ঢোকার জন্য বিশেষ অনুমতিপত্র আমার কাছে আছে। চলুন, তাহলে সেখানেই যাওয়া যাক।'

ডা. নাসের বললেন, 'অনুমতিপত্র আমিও সংগ্রহ করে এনেছি কায়রো থেকে। আগে যদি আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হত, তাহলে বেশ কিছুটা পরিশ্রম লাঘব হত আমার। কায়রোয় আমার এত পরিচিত থাকা সত্ত্বেও সরকারি দপ্তর থেকে অনুমতিপত্র বের করতে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে।'

ড. হান্স হেসে বললেন, 'সে অভিজ্ঞতা যে আমারও একদম নেই তা নয়।'

মন্দিরের দেওয়াল ঘেঁষে ডান ও বা-দিক দিয়ে দুটো রাস্তা মন্দিরের পিছন দিকে চলে গিয়েছে। ডান দিকের রাস্তাটা নীচে নেমে চলে গিয়েছে ড. হান্সের সুড়ঙ্গ ছুঁয়ে আরও নীচের দিকে, যেখানে তাঁবু খাটানো আছে, সে পর্যন্ত। সে পথে ইতিমধ্যে আমরা একবার গিয়েছি।

এবার আমরা ডা. নাসের আর ড. হান্সের পিছুপিছু বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরলাম। রাস্তার বাঁ দিকে খাদ আর ডান দিকে মরচুয়ারি মন্দিরের পাথুরে

BanglaBook.org

দেওয়াল। কিছুটা পথ এগোবার পর ডান দিকে একটা বাঁক নিয়ে মন্দিরের দেওয়ালে আটকানো একটা ভারী লোহার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজা তালাবন্ধ, তার সামনে একটা কাঠের টুল রাখা আছে। কিন্তু কোনো লোক নেই সেখানে। ড. হান্স আমাদের বললেন, 'আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন, আমি পাহারদারকে খুঁজে আনি।'

এই বলে আমাদের দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে তিনি সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেন। ডা. ঘটক ডা. নাসেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দরজার ওপাশে কী আছে?'

ডা. নাসের উত্তর দেওয়ার আগেই অংশু বলল, 'মন্দিরের নীচে যাওয়ার রাস্তা।'

অংশুর কথা শুনে ডা. নাসের চমকে তার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'তুমি জানলে কীভাবে?'

অংশু খুব অস্পষ্টভাবে উত্তর দিল, 'আমি জানি, ওখানে কোনো মূর্তি নেই, সব ছবি, সব ছবি...।'

ডা. নাসের আমার আর ডা. ঘটকের সঙ্গে চোখাচোখি করলেন তার কথা শুনে। ডা. নাসেরের মুখ দেখে ধারণা হল যে, অংশু যা বলল তা সম্ভবত সত্যি। মিনিট তিনেক পর মাথায় পাগড়িআঁটা একজন লম্বা-চওড়া চেহারার মিশরীয়কে নিয়ে ফিরে এলেন ড. হান্স। লোকটার গলায় ঝোলানো দুটো টর্চ। সে এসে কোমর থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে দিল। দেখলাম, ভিতরটা অন্ধকার। থাক থাক সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। দরজাটা খুলে দেওয়ার পর সে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, 'নো ক্যামেরা, নো ক্যামেরা।' তারপর স্থানীয় ভাষায় আরও কী যেন বলল।

ড. হান্স তার কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ক্যামেরা নিয়ে নীচে যাওয়ার নিয়ম নেই। আপনি বরং ক্যামেরার ব্যাগটা ওর কাছে রেখে দিন। ওকে আমি চিনি, আপনার তাতে কোনো ক্ষতি হবে না।'

ড. হান্সের কথা শুনে আমি তাকালাম ডা. নাসেরের দিকে। কারণ, ব্যাগে শুধু ক্যামেরা নেই। লেন্সের ভিতর সেই জিনিসটাও লুকোনো আছে। ডা. নাসের এবার আরবি ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন লোকটির সঙ্গে।

BanglaBook.org

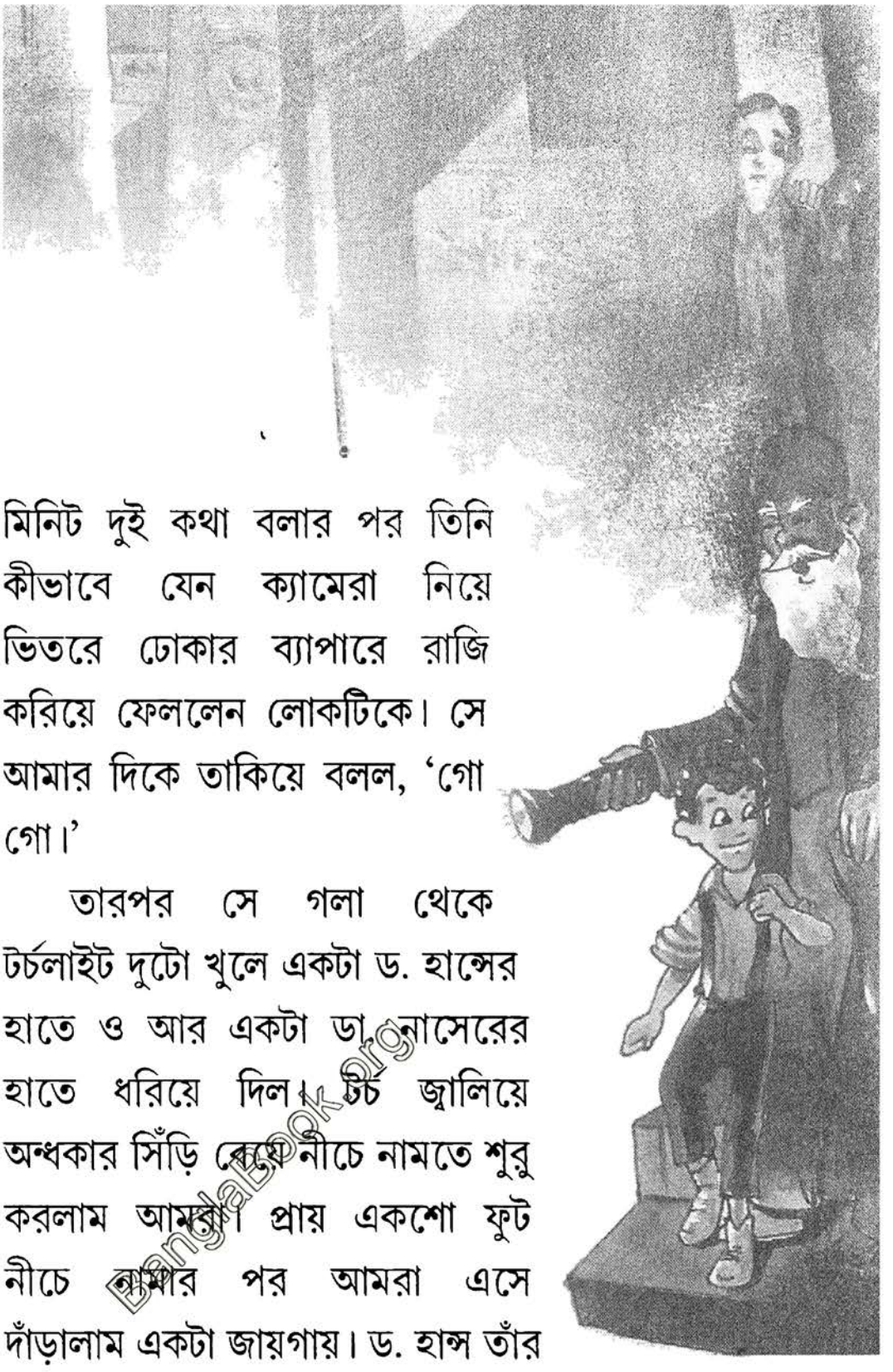

মিনিট দুই কথা বলার পর তিনি কীভাবে যেন ক্যামেরা নিয়ে ভিতরে ঢোকার ব্যাপারে রাজি করিয়ে ফেললেন লোকটিকে। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'গো গো।'

তারপর সে গলা থেকে টর্চলাইট দুটো খুলে একটা ড. হান্সের হাতে ও আর একটা ডা. নাসেরের হাতে ধরিয়ে দিল। টর্চ জ্বালিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে শুরু করলাম আমরা। প্রায় একশো ফুট নীচে নামার পর আমরা এসে দাঁড়ালাম একটা জায়গায়। ড. হান্স তাঁর হাতের টর্চটা একবার চারপাশে ঘোরালেন। দেখলাম বির

BanglaBook.org

স্তম্ভওলা বিশাল একটা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি। ঘরের দেওয়াল আর স্তম্ভ জুড়ে আঁকা রয়েছে নানা রঙের চিত্রকলা। ডা. নাসের সিলিংয়ের উপর আলো ফেললেন। সেখানেও আঁকা রয়েছে নানা ধরনের ছবি। টর্চের আলোয় আমরা সব ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। সেই হলঘরে দেওয়ালের বিভিন্ন জায়গা দিয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে। সুড়ঙ্গের মুখগুলো সব কাঠের তক্তা দিয়ে আটকানো।

ডা. নাসের বললেন, 'ওইসব সুড়ঙ্গ থেকে নাকি আরও সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে। তাদের সবকটা যে ঠিক কোথায় কোথায় চলে গিয়েছে, তা আজও ঠিকভাবে বলা যায় না। অনেক মানুষ ধনরত্নের লোভে ওইসব সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় ঢুকে মারা পড়েছে।'

ছবিগুলো দেখতে দেখতে লক্ষ করলাম, বেশ কিছু ছবিতে এক পুরুষমূর্তির মুখ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ছবির অন্য অংশগুলো কিন্তু অক্ষত। আমি ডা. নাসেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো এরকম কেন? এগুলো কি তাহলে হাটশেপসুটের ছবি যা তৃতীয় টুথমোসিস নষ্ট করে দেন?'

ডা. নাসের বললেন, 'না, এগুলো হাটশেপসুটের ছবি নয়। এ ছবিগুলো নষ্ট করেন হাটশেপসুট নিজেই।'

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে এগুলো কার ছবি?'

ডা. নাসের বললেন, 'আমি আপনাকে একটা ছোট্ট গল্প বলি। মিশরের জাঁদরেল রানি হাটশেপসুট চেয়েছিলেন এমন কিছু করে যেতে, যা দেখে হাজার হাজার বছর পরেও মানুষ স্মরণ করবে তাঁকে। কিন্তু তাঁর মনে এ ধারণাও ছিল যে, তাঁর পরবর্তী ফ্যারাওরা মিশরের ইতিহাস থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলার জন্য ধ্বংস করে ফেলতে পারে তাঁর কীর্তি। তাই তিনি অন্য ফ্যারাওদের মতো নিজের বড়ো মূর্তি বা পিরামিড না তৈরি করে মরচুয়ারি মন্দির তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। এর পিছনে কারণ হল, মরচুয়ারি মন্দিরের প্রধান আরাধ্য দেবতা হলেন মৃত্যুর দেবতা আনুবিস। স্বাভাবিক কারণেই সে সময় মিশরের মানুষজন অন্যান্য দেবদেবী অপেক্ষা আনুবিসকে বেশি ভয় পেতেন। হাটশেপসুট বুঝতে পেরেছিলেন, আনুবিসের মন্দির ধ্বংস করার সাহস পরবর্তীকালের ফ্যারাওদের হবে না। ঠিক এই কারণে কার্নাক মন্দিরে

BanglaBook.org

তৃতীয় টুথমোসিসের আমলে হাটশেপসুটের কীর্তি ধ্বংস করা হলেও রক্ষা পেয়ে যায় এই মরচুয়ারি মন্দির। কিন্তু হাটশেপসুট মরচুয়ারি মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পড়লেন আর এক সমস্যায়। কার হাতে তিনি তুলে দেবেন এই বিশাল কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব? কোনো স্থপতিই দায়িত্ব নিতে চাইছিলেন না। কারণ, এ কাজে সামান্য ভুল হলে রানি তাদের জ্যান্ত মমি বানিয়ে সারকোফ্যাগাসে পুরে ফেলবেন।

'শেষ পর্যন্ত এ কাজের দায়িত্ব সামলাবার জন্য এগিয়ে গেলেন হাটশেপসুটের বিশ্বস্ত মন্ত্রী সেনমুট। তিনি ছিলেন অনেক জ্ঞানের অধিকারী। তৈরি করে ফেললেন মরচুয়ারি মন্দিরের নকশা। এই ঊষর মরুপ্রান্তর ভরে উঠল লক্ষ শ্রমিকের কোলাহল আর হাতুড়ি-ছেনির ধাতব শব্দে। তারপর একদিন মরুভূমির বুকে মাথা তুলে দাঁড়াল রানির মরচুয়ারি মন্দির। মন্দিরের অঙ্গসজ্জার কাজ তখন চলছে, শ্রমিকরা পাথরের স্তম্ভ-দেওয়াল কুঁদে ফুটিয়ে তুলছে আশ্চর্য সুন্দর সব শিল্প। একদিন সপার্ষদ মন্দির দেখতে গেলেন রানি। মন্দিরের আশ্চর্য সুন্দর স্থাপত্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন সকলে। রানির পার্শ্বচররা বললেন, এই মন্দির নিশ্চিতভাবে অমর করে রাখবে তাঁকে। এ কথা শোনার পর অমরত্বের লোভ পেয়ে বসল সেনমুটকেও। তিনিও চাইলেন অমর হয়ে থাকতে। তাই তিনি মন্দিরের নানা লুকোনো জায়গায় গোপনে নিজের মূর্তি-ছবি ইত্যাদি তৈরি করাতে লাগলেন। মন্দির তৈরি ও তার অঙ্গসজ্জার কাজ যখন প্রায় সম্পূর্ণ, তখন কীভাবে যেন এ খবর পৌঁছোল রানির কানে। এই অমার্জনীয় অপরাধের জন্য সঙ্গেসঙ্গেই সেনমুটের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন রানি। তাঁর সৈন্যদল মরচুয়ারি মন্দিরের দিকে ছুটল সেনমুটকে ধরবার জন্য। কিন্তু বিপদ আঁচ করে সেনমুট ঢুকে গেলেন মন্দিরের নীচে সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায়। তাঁর সন্ধান আর কোনোদিন পেলেন না হাটশেপসুট। তবে রানির নির্দেশে সেনমুটের যত মূর্তি বা ছবি খুঁজে পাওয়া গেল, সব নষ্ট করে ফেলা হল। এখানে যেসব ছবির মুখ নষ্ট করে ফেলা হয়েছে সে সবই হল সেনমুটের।'

ডা. নাসেরের গল্প শুনতে শুনতে আর ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার খেয়াল হল, অংশু আমার পাশে নেই। নীচে নামার পর অংশু আমার ডান হাতটা ধরে ছিল। তারপর আমি একবার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম

BanglaBook.org

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মোছার জন্য। সম্ভবত তারপর সে আমার হাতটা আর ধরেনি। অংশুকে না দেখতে পেয়ে আমি বললাম, 'অংশু! অংশু কই?'

সঙ্গোসঙ্গে ডা. নাসের তাঁর হাতের টর্চটা অন্ধকার হলঘরের চারপাশে ঘোরাতে লাগলেন। ড. হান্সও যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে। থামগুলো ঘরের মধ্যে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, ঘরের ভিতর সম্পূর্ণটা দেখা যাচ্ছে না। টর্চের আলো যেসব জায়গায় পড়ল সেখানে দেখা মিলল না অংশুর। ডা. ঘটক চিৎকার করে ডেকে উঠলেন, 'অংশু, অংশু।'

তাঁর গলার শব্দে গমগম করে উঠল ঘরটা। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। এবার আমরা সকলে মিলে থামের পিছনগুলো খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু না, অংশু কোথাও নেই। ডা. নাসের এবার সুড়ঙ্গের মুখগুলোয় আলো ফেলতে লাগলেন। সুড়ঙ্গাগুলোর মাথার উপর এক, দুই, তিন, এভাবে নম্বর লেখা আছে। হঠাৎ একটা জায়গায় এসে আটকে গেল ডা. নাসেরের টর্চের আলোটা। সাত নম্বর সুড়ঙ্গের সামনে মাটির উপর পড়ে আছে অংশুর টুপিটা। ডা. নাসেরের পিছুপিছু আমিও পৌঁছে গেলাম সুড়ঙ্গের মুখটায়। ডা. নাসের মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলেন টুপিটা। আমরা এবার খেয়াল করলাম, সুড়ঙ্গের মুখটা যে দুটো কাঠের তক্তা দিয়ে আড়াআড়িভাবে আটকানো ছিল, তার একটা উই লেগে খসে পড়েছে। ফলে যে ফোকর সৃষ্টি হয়েছে তাতে একটা মানুষ অনায়াসে গলে যেতে পারে ভিতরে। ডা. নাসের তাঁর টর্চের মুখটা মাটির দিকে ঘোরালেন। দেখলাম, সুড়ঙ্গের মুখে জমে-থাকা ধুলোর উপর স্পষ্ট হয়ে আছে অংশুর পায়ের ছাপ। আর দেরি না করে কাঠের তক্তার ফাঁক গলে ডা. নাসের ঢুকে পড়লেন ভিতরে। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম।

ভিতরে ঢুকে ডা. নাসের তাঁর টর্চের আলো ফেললেন সামনের দিকে। টর্চের আলো সুড়ঙ্গের অন্ধকার ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ল শেষ মাথা পর্যন্ত। এবার আমরা দেখতে পেলাম অংশুকে। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে সে সামনের দিকে হেঁটে চলেছে। আমি চিৎকার করে ডেকে উঠলাম তার নাম ধরে, কিন্তু সে থামল না। আগের মতোই হাঁটতে থাকল। যেন সে শুনতেই পায়নি আমার চিৎকার। আমি আর ডা. নাসের এবার ছুটতে শুরু করলাম তাকে

BanglaBook.org

লক্ষ করে। সুড়ঙ্গের দু-পাশ দিয়ে কিছু দূর অন্তর বেরিয়ে গিয়েছে আরও নানা সুড়ঙ্গ। আমরা যখন তার কাছাকাছি চলে এসেছি, তখন সে এরকমই একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমরাও ঢুকে পড়লাম তার মধ্যে। দেখতে পেলাম, হাত দশেক দূরে সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে অংশু। আমি দৌড়ে তাকে ধরতে গেলাম। কিন্তু তার আগেই মাথায় কীসের একটা প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে পড়লাম। জ্ঞান হারাবার আগে শুধু বুঝতে পারলাম, ডা. নাসেরের হাতের টর্চটা মাটির উপর আছড়ে পড়ে নিভে গেল। তার সঙ্গেসঙ্গেই অন্ধকার হয়ে গেল সব কিছু।

১১

যখন প্রথম জ্ঞান ফিরল তখন বুঝতে পারলাম বালির উপর শুয়ে আছি। মাথার উপর রুপোর থালার মতো গোল চাঁদ আর দু-একটা তারা চোখে পড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, আমি কে? আমি এখন কোথায়? কিন্তু কিছুই মনে করতে পারলাম না। কিছুক্ষণ এভাবে শুয়ে থাকার পর উঠে বসবার চেষ্টা করলাম। তখনই বুঝতে পারলাম, আমার পা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। আমি শুয়ে ছিলাম চিত হয়ে। ডান দিকে মাথাটা একটু কাত করে। ঘাড়টা বাঁ-দিকে কাত করতেই মাথাটা জগদ্দল পাথরের মতো ভারী মনে হল। অনেক কষ্টে বাঁ-দিকে মুখটা ফেরালাম। বাঁ-দিকে আমার পাশেই বালির উপর কী যেন একটা জিনিস পড়ে রয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বুঝলাম সেটা আমার ক্যামেরার ব্যাগ! তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ে গেল সব কিছু। কিন্তু যেটা বুঝতে পারছিলাম না তা হল, আমি এখন কোথায়? সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে এই খোলা আকাশের নীচে আমি এলাম কীভাবে! অংশু, ডা. ঘটক, ডা. নাসের তাঁরাই বা কোথায়?

অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। দেখলাম, একটা গুহার সামনে বালির উপর পড়ে রয়েছি। কিছু দূরে তাঁবু খাটানো। তার সামনে বিরাট একটা অগ্নিকুণ্ড ঘিরে কয়েকটা কালো কালো ছায়ামূর্তি বসে রয়েছে। টুকরো টুকরো কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসছে সেদিক থেকে। তারা কী বলছে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

BanglaBook.org

একটু পরে ডা. নাসেরকেও দেখতে পেলাম আমি। যেদিকে আমি প্রথমে মুখ করে শুয়ে ছিলাম তার একটু দূরে একটা বালির ঢিপির আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে তাঁর মাথা ও ঘাড়ের কিছুটা অংশ। তাঁর বিরাট টাকটা দেখে বুঝতে পারলাম, তিনি ডা. নাসেরই। তবে তিনি কিন্তু একদম নড়ছেন না। মনে হয় ঢিপির আড়ালে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। আমি অনেক কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর দিকে এগোতে লাগলাম। এগোতে এগোতে আমি যখন তাঁর প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি, ঠিক তখনই তাঁবুর দিক থেকে চিৎকার ভেসে এল আমার কানে। চমকে সেদিকে তাকিয়ে দেখি, আগুনের পাশে বসা ছায়ামূর্তিগুলো দৌড়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তাদের ওভাবে আসতে দেখে আমি হঠাৎ কেন জানি না উঠে দাঁড়াতে গেলাম। কিন্তু পা-দুটো যে দড়ি দিয়ে বাঁধা তা খেয়াল ছিল না আমার। তাই আবার বালির উপর পড়ে গেলাম। মাথার পিছনে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার জ্ঞান হারালাম।

একটা শব্দে যখন আবার আমার জ্ঞান ফিরল তখন সূর্যের আলোয় প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। চোখ খুলেই চোখের পাতা আবার বন্ধ করে ফেললাম। সেই অবস্থায় কে যেন আমার মুখের উপর বারকয়েক জলের ঝাপটা মারল। চোখ মেলতেই সে এক ঝটকায় হাত ধরে টেনে আমাকে বসিয়ে দিল। দেখলাম, আমার সামনে খাকি পোশাকপরা জনা দশেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কাঁধে রাইফেল আর কোমরে বাঁকানো ছুরি ঝুলছে। দু-জনের হাতে আবার চামড়ার ফিতেয় বাঁধা হিংস্র চেহারার গোটা পাঁচেক কুকুর। তাদের গায়ে লোম নেই, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে তারা জিভ বের করে বসে আছে, ফোঁটা ফোঁটা লালা চুইয়ে পড়ছে বালির উপর। বুঝতে পারলাম, ওদেরই চিৎকারে জ্ঞান ফিরেছে আমার।

দেখলাম কয়েক হাত দূরে বসে আছেন ডা. নাসের। তাঁর পা দুটো আমারই মতো দড়ি দিয়ে বাঁধা। তাঁর চোখে চোখ পড়তেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে অনেক কষ্টে যেন একটু হাসলেন। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলো নিজেদের মধ্যে মিনিটখানেক কীসব কথাবার্তা বলল। সে ভাষার বিন্দুবিসর্গ আমি বুঝতে পারলাম না। জানি না ডা. নাসের কিছু বুঝতে পারলেন কি না। লোকগুলোর মধ্যে দু-জন এবার তাদের কাঁধ থেকে

BanglaBook.org

রাইফেল খুলে নিল। তারপর নীচু হয়ে বালির উপর বসে আমাদের পায়ের বাঁধন খুলে দিতে লাগল। যে দু-জনের হাতে তারা রাইফেল দিয়েছিল সে দু-জন রাইফেল দুটো তাক করে রইল ডা. নাসের আর আমার দিকে। বুঝতে পারলাম যে, এ লোকগুলোর হাতেই আমাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। কিন্তু এদের হাতে এলাম কীভাবে? আর কেন এলাম? এ দুটো প্রশ্নের উত্তর অবশ্য কিছুক্ষণ পরই পেয়ে গেলাম।

লোকগুলো পা থেকে দড়ি খুলে দিয়ে আমাকে আর ডা. নাসেরকে পাশাপাশি দাঁড় করাল। তারপর আমাদের কোমরে দড়ি বাঁধল। চারপাশে যত দূর চোখ যায় শুধু ধু-ধু মরুভূমি। তার মধ্যে শুধু জেগে রয়েছে ছোট্ট একটা পাহাড় আর তার গুহামুখ, যার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। একজন ক্যামেরার ব্যাগটা কুড়িয়ে এনে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিল। কোমরের দড়ির প্রান্ত ধরে তারপর আমাদের হাঁটিয়ে নিলে চলল তাঁবুর দিকে। তাঁবুটা বেশ বড়ো। তার পিছনে একটা জিপগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেটা নজরে পড়ল আমার। যে লোকগুলোর হাতে আমরা বন্দি, তার মধ্যে একটা বেশ ঢ্যাঙা লোক ছিল। আপাদমস্তক তার কালো পোশাকে মোড়া। দু-গালে তার বিচিত্র উলকি আঁকা। লোকটা অনেকক্ষণ থেকেই অন্যদের নানারকম নির্দেশ দিচ্ছিল। সম্ভবত সে-ই দলপতি।

BanglaBook.org

তাঁবুর সামনে আসবার পর সকলকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে লোকটা তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল। তার কয়েক মুহূর্ত পর বাইরে বেরিয়ে এসে তার সঙ্গীদের উদ্দেশে কী যেন বলল। যে দু-জন লোক দড়ি ধরে ছিল তারা এবার দড়ি ছেড়ে দিয়ে ধাক্কা মেরে আমাকে আর ডা. নাসেরকে তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়ে দিল। বাইরের আলো থেকে ভিতরে ঢোকার পর প্রথমে কিছুই আমার নজরে পড়ল না। কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল চোখের সামনে সব কিছু স্পষ্ট হতে। দেখলাম, তাঁবুর এক কোনে একটা গদি পাতা, আর তার উপরে বসে আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আলতুনিয়া।

হঠাৎ আমার কানে এল অংশুর গলা, 'তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? দেখো না এই লোকগুলো কাল রাত থেকে আমাকে এখানে আটকে রেখেছে।'

চমকে তাকিয়ে দেখি, তাঁবুর আর এক কোনায় অন্ধকারমতো জায়গায়

একটা ক্যাম্প খাটের উপর বসে আছে অংশু। অবশ্য তার হাত-পা বাঁধা নেই, কিন্তু তার পাশে বসে আছে দু-জন সশস্ত্র লোক। পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছে তারা যাযাবর নয়, আলতুনিয়ার নিজস্ব সঙ্গী। অংশু মনে হয় উঠে দাঁড়াল আমাদের কাছে চলে আসার জন্য। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে আলতুনিয়ার একজন সঙ্গী তার হাতটা টেনে এমনভাবে খাটের উপর বসিয়ে দিল যে, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল অংশু। আলতুনিয়া তাই দেখে একবার দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল। তাঁবুর ভিতরের মৃদু আলোয় চকচক করে উঠল তার সোনার দাঁত। এর পর সে ডা. নাসেরের উদ্দেশে বলল, 'আমি সত্যিই দুঃখিত নাসের, এমনভাবে আপনাকে এখানে ধরে আনতে হল বলে। কিন্তু কী করব? নিমন্ত্রণ করলে তো আর আপনি এখানে আসতেন না!'

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে উত্তেজিত না হয়ে ডা. নাসের ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের এখানে আনার কারণটা জানতে পারি কি? ছেলেটাকেই বা তোমরা এমনভাবে ধরে রেখেছ কেন? আর বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাই বা কে?'

তাঁর প্রশ্ন শুনে আর একবার নিঃশব্দে হাসল আলতুনিয়া। তারপর বলল, 'আপনার সব প্রশ্নের উত্তরই আমি একে একে দিচ্ছি। প্রথমত, আপনাকে আমি ধরে এনেছি আপনার কাছে প্যাপাইরাসের যে বাকি অংশটা আছে সেটা পাওয়ার জন্য। দ্বিতীয়ত, আমি ছেলেটিকে ধরেছি, কারণ, আপনার বাড়ি থেকে হাতিয়ে আনা ক্যাসেটটার কণ্ঠস্বরটা যে ওর, তা আমার বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়নি। হয়তো ও আমাকে মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা নতুন কিছুর সন্ধান দেবে। প্যাপাইরাসের যে অংশটা আমার হাতে আছে আর ছেলেটির ক্যাসেটবন্দি কণ্ঠস্বর আমাকে এই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। আর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটা হল, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো এক যাযাবর গোষ্ঠীর। আফ্রিকার বিস্তৃত মরুভূমি অঞ্চলই হল ওদের ঘরবাড়ি। মরুভূমির কঠিন পরিবেশের মধ্যে বাস করতে হয় বলে প্রকৃতিগতভাবেই ওরা খুব নিষ্ঠুর। মানুষ মারতে ওদের হাত কাঁপে না। মাঝে মাঝে আমি ওদের বন্দুক-বারুদ ইত্যাদি সরবরাহ করি। যে কারণে ওরা আমার খুব বাধ্য।

মজার ব্যাপার হল, এই অশিক্ষিত লোকগুলো নিজেদের সেনমুটের

BanglaBook.org

বংশধর বলে মনে করে। হাটশেপসুটের ভয়ে মরচুয়ারি মন্দির থেকে পালাবার সময় নাকি সেনমুট তাঁর যাবতীয় ধনরত্ন মাটির গভীরে কোথাও লুকিয়ে রেখে যান। এদের বিশ্বাস সেই ধনরত্ন আজও লুকোনো আছে। তাই বংশপরম্পরায় এই লোকগুলো মরুভূমির বুকে আজও খুঁজে চলেছে সেই গুপ্তভাণ্ডার। আমি ওদের বলেছি, সেই গুপ্তভাণ্ডারের খোঁজ পেয়ে আপনারা তা লুঠ করতে এসেছেন। তাই ওরাই আপনাদের মরচুয়ারি মন্দিরের সুড়ঙ্গ থেকে এখানে ধরে এনেছে। আপনি যদি প্যাপাইরাসটা আমার হাতে তুলে না দেন, তাহলে আমি আপনাদের ওদের হাতে তুলে দেব। তারপর আপনাদের ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবে।'

এই বলে আলতুনিয়া স্থির দৃষ্টিতে ডা. নাসেরের দিকে তাকিয়ে রইল উত্তরের অপেক্ষায়। আমি বুঝতে পারলাম, আলতুনিয়া আর ডা. নাসেরের মধ্যে একটা তীব্র স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভিতরে ভিতরে দু-জনই খুব উত্তেজিত কিন্তু তা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন দু-জনেই। ডা. নাসের ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তুমি কি মনে করো আমরা সেনমুটের গুপ্তভাণ্ডারের সন্ধান জানি? প্যাপাইরাস বা ছোটো ছেলেটার কথার মধ্যে কোথাও তো তা বলা নেই।'

আলতুনিয়া বলল, 'হ্যাঁ, আমি তা জানি। কারণ, হাইয়ারোগ্লিফিক আমি অন্যদের চেয়ে ভালোই পড়তে পারি। তবে তার মধ্যে একটা সমাধির স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ছোটো ছেলেটির রেকর্ড করা টুকরো টুকরো শব্দও সে কথাই সমর্থন করছে। প্যাপাইরাসের বাকি অংশে হয়তো সমাধিতে যাওয়ার পথের হদিশ দেওয়া আছে। আমি সেই সমাধি পর্যন্ত পৌঁছোতে চাই। কে বলতে পারে সেখানে তুতানখামেনের সমাধির মতো কোনো অতুল ঐশ্বর্য লুকিয়ে আছে কি না?'

ডা. নাসের এবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'প্যাপাইরাসের বাকি অংশটা আমার কাছে নেই, আবার আছেও।'

আলতুনিয়া বলল, 'মানে?'

ডা. নাসের বললেন, 'প্যাপাইরাসটা আছে ব্যাঙ্কের ভল্টে। তবে তার একটা কপি করা আছে এখানে।' এই বলে তিনি নিজের কপালে বার দুই টোকা মারলেন।

BanglaBook.org

'তাহলে কি ধরে নেব, সেই সমাধিতে পৌঁছোবার রাস্তা আপনার জানা আছে?' প্রশ্ন করল আলতুনিয়া।

'সমাধিটা ঠিক কোথায় আছে তা বলতে পারব না। তবে যা ইঙ্গিত আছে তাতে মরচুয়ারি মন্দিরের নীচেই কোনো সুড়ঙ্গো হবে। একটা নির্দিষ্ট কক্ষের কথা বলা আছে প্যাপাইরাসে। সেই কক্ষ পর্যন্ত না পৌঁছোলে পথের দিশা পাওয়া যাবে না।' উত্তর দিলেন ডা. নাসের।

'তাহলে সেই কক্ষ পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যেতে হবে আমাকে। তারপর আমি ছেড়ে দেব আপনাদের।'

'ওই পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার দরকার কী? আমি তোমাকে এখনই বলে দিতে পারি সেই পথ।'

এবার বেশ জোরে হেসে উঠল আলতুনিয়া। তারপর বলল, 'আমাকে কি আপনি দুধের শিশু পেয়েছেন। আপনি যে সত্যি কথা বলছেন তার গ্যারান্টি কোথায়? তা ছাড়া আপনারা সুড়ঙ্গ থেকে উধাও হয়ে যাওয়ায় আপনাদের লোকগুলোও নিশ্চয়ই বসে নেই। সুড়ঙ্গের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁরা আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। হয়তো তাঁদের সঙ্গে পুলিশের লোকও আছে। আপনাদের ছেড়ে দিলে তাঁদের খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা আমার কম নেই। আপনি যাবেন আমাকে নিয়ে। আর যতক্ষণ আমার উদ্দেশ্য সফল না হয়, ছোটো ছেলেটি আর আপনার সঙ্গী বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর হেফাজতে থাকবে।'

আলতুনিয়ার কথা শুনে এবার হেসে উঠলেন ডা. নাসেরও। তারপর বললেন, 'সমাধিতে ধনসম্পদ পেলে তুমি যে আর বাইরের লোকগুলোর ছায়া মাড়াবে না, তা আমি জানি। ফলে ছোটো ছেলেটি আর আমার সঙ্গী কোনোদিনই সভ্য জগতে ফিরে যাবে না। মরুভূমির বালির নীচেই ওদের সমাধি দিয়ে দেওয়া হবে। আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজি, কিন্তু ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া ছোটো ছেলেটি না থাকলে পথের হদিশ না-ও মিলতে পারে। কারণ, আমার মনে হয়েছে ছেলেটির মধ্যে বিশেষ কিছু একটা ব্যাপার লুকিয়ে আছে, যা ওই সমাধি খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করবে।'

'আর আপনার পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীকে কী কাজে লাগবে? তাহলে উনিই নয় জামিন থাকুন,' এই বলে আলতুনিয়া তাকাল আমার দিকে।

BanglaBook.org

হঠাৎ যেন আমার বুকের ভিতর হাতুড়ি পেটা শুরু হল। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম নিজেকে সংযত রাখতে। ডা. নাসের বললেন, 'না, সেটা হয় না। কারণ, প্রথমত, ও না থাকলে ছেলেটির সঙ্গে কমিউনিকেট করার ক্ষেত্রে ভাষাগত সমস্যা হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সবচেয়ে বড়ো কথা হল, ওকে রেখে আমি তোমার সঙ্গে এক পা-ও কোথাও নড়ব না।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ডা. নাসের। তারপর বললেন, 'আমার যা মত তা আমি বললাম। এবার তুমি যা খুশি করতে পার। তবে একটা জিনিস মনে রেখো, আমাদের তিন জনের কারও কোনো ক্ষতি হলে কিন্তু এ জীবনে আর তুমি ওই সমাধির সন্ধান পাবে না।'

আলতুনিয়া বেশ কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল তাঁর কথা শুনে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি। তিন জনেই যাবে। কিন্তু কোনো চালাকির চেষ্টা করলেই খুলি উড়ে যাবে। এখন আমি তল্লাশি করে দেখব প্যাপাইরাসের বাকি অংশটা আপনাদের কাছে আছে কি না। যদি থাকে, তাহলে আর কষ্ট করে আমার সঙ্গে যেতে হবে না। বাইরের কুকুরগুলো অনেক দিন ভালো করে খায়নি। মানুষের মাংস ওদের মন্দ লাগবে না!'

আলতুনিয়ার ইশারায় অংশুর পাশে বসে থাকা এক সঙ্গী উঠে এসে আমাদের তল্লাশি শুরু করল। প্রথমে ডা. নাসেরকে তারপর আমাকে। ক্যামেরার ব্যাগটা দেখার সময় লোকটি যখন লেন্সটা একবার হাতে নিল, তখন যেন মনে হচ্ছিল আমার হৃৎপিণ্ড থেমে গিয়েছে। শুধু কানে আসছিল তাঁবুর বাইরে কুকুরগুলোর গর্জন। আমি একবার তাকালাম ডা. নাসেরের দিকে। চোখের ইশারায় তিনি আমাকে শান্ত থাকতে বললেন। লোকটি লেন্সটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। তারপর ক্যামেরা ইত্যাদির সঙ্গে আবার ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল। তল্লাশি শেষ হওয়ার পর আলতুনিয়া অংশুর পাশে বসা একটি লোককে বলল অংশুকে ছেড়ে দিতে। লোকটি তার হাতটা ছাড়ার সঙ্গেসঙ্গেই অংশু ছুটে এসে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। তারপর আমাকে প্রশ্ন করল, 'ডা. ঘটক কোথায়?'

আমারও মনে হল, ডা. ঘটক আমাদের খুঁজে না পেয়ে কী অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন এখন! হয়তো আমার আর অংশুর সঙ্গে তাঁর আর কোনোদিন দেখা হবে না। আমাদের দু-জনকে মিশরে আনার জন্য

BanglaBook.org

বাকি জীবন নিজেকে দোষারোপ করবেন। আমি অংশুর মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলতুনিয়া ও তার সঙ্গীরা আমাদের নিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল।

তাঁবুর বাইরে আসার পর যাযাবরদের সর্দার সেই ঢ্যাঙা লোকটা এগিয়ে এল আলতুনিয়ার দিকে। দু-জনের মধ্যে অচেনা ভাষায় কী যেন কথাবার্তা শুরু হল। একটু পরেই দেখলাম দু-জনেই উত্তেজিত হয়ে পরস্পরকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। ঢ্যাঙা লোকটি বেশি উত্তেজিত। বারবার সে গুহাটার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে কী যেন বলছে। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার হাত পাঁচেক পিছনে দাঁড়িয়ে আমরা। তাদের উত্তেজিত হতে দেখে আলতুনিয়ার নিজস্ব তিন সঙ্গীর মধ্যে দু-জন আলতুনিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অন্য একজন আমাদের থেকে হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আলতুনিয়া আর ঢ্যাঙা লোকটির কথা শুনতে লাগল। তাঁবুর একটু দূরে বসা অন্য যাযাবরদের দৃষ্টিও দেখলাম তাদের সর্দার ও আলতুনিয়ার উপর নিবদ্ধ। সেই সুযোগে ডা. নাসের ফিসফিস করে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'যাযাবর সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আলতুনিয়া মাঝে মাঝে ভুল করে আরবি শব্দ বলে ফেলেছে। তাতে যতটুকু বুঝছি তা হল, আলতুনিয়া ওদের নিয়ে গুহায় ঢুকতে চাইছে না। কিন্তু ওরা আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে। আপনি ভয় পাবেন না, ওই সমাধি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আলতুনিয়া আমাদের কাউকে মারবে না। আগে আমাদের সুড়ঙ্গপথে হাটশেপসুটের মরচুয়ারির কাছ পর্যন্ত পৌঁছোতে হবে। তারপর ওর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে। আর সুড়ঙ্গে ঢোকার পর চেষ্টা করবেন আমরা তিন জন যেন সবসময় কাছাকাছি থাকতে পারি।'

আলতুনিয়ার যে সঙ্গী আমাদের একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে মনে হয় বুঝতে পারল ডা. নাসের আমাকে কিছু বলছেন। তাই সে একেবারে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। অংশুকে দেখলাম সে শুধু একদৃষ্টিতে লক্ষ করছে যাযাবরদের হিংস্র কুকুরগুলোকে। আমি তার হাতটা শক্ত করে ধরে আছি। তাকে সাহস দেওয়ার জন্য আমি বললাম, 'ভয় নেই, ওরা তোমার কিছু করতে পারবে না।'

অংশুর গলা দিয়ে শুধু একটা অস্পষ্ট শব্দ বের হল, 'আনুবিস!'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর যাযাবর সর্দার আর আলতুনিয়ার মধ্যে উত্তেজিত কথাবার্তা থেমে গেল। মনে হল, তারা দু-জনে শেষ পর্যন্ত একটা সমঝোতা সূত্রে পৌঁছোল। তার একটু পরেই আলতুনিয়া ও যাযাবরদের দলের সঙ্গে আমরা এসে দাঁড়ালাম সুড়ঙ্গে ঢোকার গুহামুখের সামনে। গুহায় ঢোকার আগে সর্দার নিজের দলের লোকদের উদ্দেশে কী যেন বলতে শুরু করল। আর তার কথা শুনে লোকগুলো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। ডা. নাসের তাই দেখে আলতুনিয়াকে প্রশ্ন করলেন, 'ও কী বলছে?'

আলতুনিয়া বলল, 'ও বলছে যে, সে ওদের পূর্বপুরুষ সেনমুটের রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করতে যাচ্ছে। শিগগিরই সে ফিরে আসবে তার সঙ্গীদের কাছে। যে সম্পদ সে পাবে তা দিয়ে মরুভূমির বুকে নতুন এক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। তার আর সেনমুটের দুটো বিরাট মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করা হবে সেখানে, এই সব আর কি।' এই বলে আলতুনিয়া হাসল।

সূর্যের আলো ঝিলিক মারল তার দাঁতে। ডা. নাসের হেসে বললেন, 'আমি যদি ওদের বলি যে, আমরা সেনমুটের রত্নভাণ্ডারের সন্ধান জানি না, তুমি ওদের ভাঁওতা দিচ্ছ, তাহলে?'

আলতুনিয়া বলল, 'সে চেষ্টা তুমি করে দেখতে পার। কিন্তু ওরা ইংরেজি বা আরবির বিন্দুবিসর্গ বোঝে না। কাজেই কোনো লাভ হবে না।'

যাযাবর সর্দারের ভাষণ শেষ হওয়ার পর আলতুনিয়া তার সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বলল। তারপর ডা. নাসেরকে বলল, 'এই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে হাটশেপসুটের মন্দিরের নীচে পৌঁছোতে ঘণ্টা আটেক সময় লাগবে। আমরা এই সুড়ঙ্গে ঢুকব ঠিকই, কিন্তু তারপর অন্য সুড়ঙ্গ ধরে ঘুরপথে মন্দিরের তলায় পৌঁছোব। তাতে একটা দিন লেগে যাবে ঠিকই, কিন্তু তা অনেক বেশি নিরাপদ। কারণ, আমি চাই না হাটশেপসুটের মন্দিরের নীচে সুড়ঙ্গপথে তোমার সঙ্গীরা, যারা হয়তো তোমাদের খুঁজছে অথবা অন্য কোনো অনুসন্ধানকারী দলের সঙ্গে আমার দেখা হোক। আর একটা কথা মগজে ঢুকিয়ে নাও। আমাকে কোনো বিপদে ফেলার চেষ্টা করলে সঙ্গেসঙ্গে মারা পড়বে তোমরা।'

ডা. নাসের তার কথা শুনে হেসে বললেন, 'আচ্ছা মনে থাকবে।'

BanglaBook.org

গুহায় ঢোকার আগে একটা লোক তাঁবুর ভিতর থেকে বেশ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এল। খাবারও এল তার সঙ্গে। আমাদের খেতে দেওয়া হল রুটিজাতীয় একধরনের খাবার আর জল। খাবার পর শরীরটা যেন একটু চাঙা মনে হল। আসলে তার আগে পর্যন্ত যেন খিদে-তেষ্টার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা।

সব মিলিয়ে আট জন ঢুকলাম গুহার ভিতর সুড়ঙ্গপথে। আমরা তিন জন, আলতুনিয়া ও তার দুই সঙ্গী এবং যাযাবর সর্দার ও তার এক সঙ্গী। আলতুনিয়া ডা. নাসেরকে বলল, 'যে গুহামুখ দিয়ে আমরা সুড়ঙ্গে ঢুকলাম, তার নাম জানেন আপনি?'

ডা. নাসের জবাব দিলেন, 'না।'

আলতুনিয়া বলল, 'এই গুহামুখের নাম 'সেনমুটের গুহা'। প্রাচীন প্রবাদ হল, হাটশেপসুটের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে সেনমুট নাকি এ পথেই মরুভূমির বুকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আমার নিজেরও ধারণা, সেনমুটই এই সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিলেন।'

ডা. নাসের প্রশ্ন করলেন, 'এ ধারণার ভিত্তি কী?'

আলতুনিয়া বলল, 'আমি দেখেছি এই সুড়ঙ্গের অনেক জায়গায় সারস পাখির ছবি খোদাই করা আছে। সেসময় ফ্যারাওদের ঘনিষ্ঠ অভিজাত ব্যক্তিরা নানাধরনের প্রতীক ব্যবহার করতেন। অনেক দিন আগে হাটশেপসুটের আমলের এক চিত্রলিপি দেখেছিলাম। তাতে হাটশেপসুটের এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী, তাঁর ব্যক্তিগত প্রতীকচিহ্ন হিসেবে সারস পাখির ছবি ব্যবহার করতেন, সেই উল্লেখ আছে। নাম উল্লেখ না থাকলেও আমার বিশ্বাস, সারস পাখির প্রতিকৃতি ব্যবহারকারী ওই ব্যক্তি হলেন সেনমুট। আর এই সুড়ঙ্গ তিনিই তৈরি করেন।'

আলতুনিয়ার কথা শুনে ডা. নাসের কিছুটা আক্ষেপের সুরে বললেন, 'তোমার বেশ কিছু ভালো গুণ ছিল আলতুনিয়া! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তা তুমি ভালো কাজে লাগালে না!'

সুড়ঙ্গের মধ্যে চলতে চলতে আলতুনিয়া এর পর ঝাঁঝিয়ে উঠে ডা. নাসেরকে বলল, 'ভালো কাজে লাগিয়ে কী হবে শুনি? আপনি তো নিশ্চয়ই আবু হোসেনকে চিনতেন। তাঁর মতো আর কোনো মিশর-

BanglaBook.org

বিশেষজ্ঞ চিত্রলিপি পড়তে পারতেন না। তাঁর সাহায্যে কত সমাধির যে সন্ধান মিলেছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কত লোক তাঁকে ব্যবহার করে অর্থ-নাম-যশ কামিয়েছে। কিন্তু আবু হোসেনের কিছুই হয়নি, না অর্থ, না যশ! শেষ জীবনে তাঁকে ভিক্ষে করে কাটাতে হয়েছে কায়রো মিউজিয়ামের সামনে আল তহরি স্কোয়ারে। মারা যাওয়ার পর অন্য ভিখিরিরা চাঁদা তুলে তাঁর সমাধির ব্যবস্থা করেছিল। এই তো হল ভালো কাজ করার ফল!'

আলতুনিয়ার কথা শুনে ডা. নাসের বললেন, 'আসলে তোমার মতো মানুষরা নিজেদের অপরাধের সমর্থনে একটা করে যুক্তি খাড়া করে রাখে। তাই তুমি এ উদাহরণটা দিলে।' ডা. নাসেরের এ কথার কোনো উত্তর দিল না আলতুনিয়া।

সুড়ঙ্গটা ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়ে ডান দিকে একটা বাঁক নিয়েছে। এতক্ষণ কোথা দিয়ে যেন একটা আবছা আলো ভেসে আসছিল। মনে হয় মাথার উপরের কোনো ফাটল দিয়ে। কিন্তু বাঁকের পরই শুরু হল ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলতুনিয়ার সঙ্গীরা বেশ কয়েকটা মশাল সঙ্গে এনেছিল। বাঁকের মুখে এসে তারই একটা জ্বালানো হল। তারপর সেই অন্ধকার রাজ্যের মধ্যে আমরা ঢুকলাম।

এ সুড়ঙ্গপথ খুব সংকীর্ণ। কোনো রকমে দু-জন লোক পাশাপাশি চলতে পারে। সুড়ঙ্গের ছাদও খুব নীচু, প্রায় মাথায় ঠেকে যাচ্ছে। প্রথমে মশাল হাতে চলেছে আলতুনিয়ার একজন সঙ্গী। তারপর আলতুনিয়া এবং যাযাবরদের সর্দার। এদের পিছনে ডা. নাসের, অংশু ও আমি। আমার পিছনে অন্য দুই জন। এভাবে সার বেঁধে চলতে লাগলাম আমরা। পায়ের নীচে এবড়োখেবড়ো পাথরে ভরতি। তার উপর দিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল প্রত্যেকেরই। তাই খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছিলাম আমরা। টানা ঘণ্টা দুয়েক চলার পর একজায়গায় থামলাম। জায়গাটা একটু চওড়া, মানে একটা ছোটো ঘরের মতো। সেখান থেকে সুড়ঙ্গ দু-দিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে একটা সুড়ঙ্গ বাঁ-দিকে বেঁকে গিয়েছে। সেটা দেখিয়ে আলতুনিয়া বলল, 'এ পথে গেলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমরা মরচুয়ারি মন্দিরে পৌঁছে যেতে পারি। এ পথ দিয়েই ধরে আনা হয়েছিল আপনাদের। কিন্তু আমরা ধরব ডান

BanglaBook.org

দিকের সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গ ভ্যালি অফ কিংসের নীচ দিয়ে পৌঁছেছে মরচুয়ারি মন্দিরের নীচে।'

আমরা ঢুকলাম ডান দিকের সুড়ঙ্গে। এ সুড়ঙ্গ আরও বেশি সংকীর্ণ। ছাদও বেশ নীচু। একটু অসাবধান হলেই পাথরের ছাদে মাথা ঠুকে যাওয়ার আশঙ্কা। ঢ্যাঙা যাযাবর সর্দারটি বেশ কয়েকবার ঠোক্কর খেল সুড়ঙ্গে ঢোকার পরই। তা দেখে মনে মনে অবশ্য বেশ আনন্দই হল। অংশু চলেছে ঠিক আমার সামনে সামনে। আমি তাকে বার দুয়েক জিজ্ঞেস করলাম, তার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না?'

সে বলল, 'না।'

ঘণ্টা তিনেক সেই সুড়ঙ্গ ধরে চলার পর আমরা এসে পৌঁছোলাম একটা হলঘরের মতো জায়গায়। আলতুনিয়া বলল, 'আমরা এখানে একটু বিশ্রাম নেব।'

তার সঙ্গী মশালটা গুঁজে দিল দেওয়ালের খাঁজে একটা উঁচুমতো জায়গায়। মাটিতে জমে আছে শতাব্দী প্রাচীন পুরু ধুলোর আস্তরণ। তার উপরেই বসে পড়লাম সকলে। অংশু আমাকে বলল, 'আমার জলতেষ্টা পেয়েছে।'

আলতুনিয়ার এক সঙ্গীর কাছ থেকে ইশারায় জলের বোতল চাইলাম। যাতে কোনো ভাবেই পালাতে না পারি, সম্ভবত সেজন্যই আমাদের কোনো জলের বোতল দেওয়া হয়নি। অথচ আমরা ছাড়া প্রত্যেকেরই, এমনকী আলতুনিয়ার কোমরেও ঝুলছে একটা জলের বোতল। জল চাইতেই সে আলতুনিয়াকে আরবি ভাষায় কী একটা বলল। মনে হল, জল দেওয়ার ব্যাপারে সে আলতুনিয়ার কাছে অনুমতি চাইল। তারপর সে কোমর থেকে জলের বোতল খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি বোতলটা নিয়ে অংশুকে দিলাম। সে কয়েক ঢোক জল খাওয়ার পর আমি আবার সেটা ফিরিয়ে দিলাম আলতুনিয়ার সেই সঙ্গীর দিকে।

তার পরমুহূর্তেই অংশু হঠাৎ ভয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল! সে কেন এরকম ভয় পেল আমি প্রথমে তা বুঝতে পারলাম না। পরে অংশুর দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকাতেই আমার বুকটাও প্রথমে ধক করে উঠল। মশালের আলোটা হালকা হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে সারা

BanglaBook.org

ঘরে। সেই আলোয় দেখতে পেলাম, আমরা যেখানে বসে আছি তার ফুট তিরিশেক দূরে উলটো দিকের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে একটা নরকঙ্কাল! তার দুটো পায়ে বুট জুতো আর গায়ে কাপড়ের টুকরো এখনও লেগে রয়েছে। আশপাশেও ছড়িয়ে আছে বেশ কিছু জিনিসপত্র। তবে আবছা আলোয় সেসব ঠিক ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না। অংশু আমাকে জড়িয়ে ধরল দেখে আলতুনিয়া বুঝতে পারল অংশু ভয় পেয়েছে। এবং ভয়ের কারণটাও তার বুঝতে দেরি হল না।

আলতুনিয়া শব্দ করে হেসে উঠে কঙ্কালটার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ও নড়বে না। কুড়ি বছর আগেও ওকে আমি ওখানেই একইভাবে বসে থাকতে দেখেছি। হয়তো একশো বছর ধরে সে ওখানে এমন ভাবেই বসে আছে। লোকটি হয়তো কোনো সমাধির সন্ধানে সুড়ঙ্গে ঢুকেছিল, তারপর আর বাইরে বের হতে পারেনি। খিদে-তেষ্টায় শুকিয়ে মরেছে। সুড়ঙ্গে এসব দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়।'

ইতিমধ্যে অন্যদের নজরে পড়েছে কঙ্কালটা। আমি অংশুকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার পর সে শান্ত হল। আমার ডান পাশে বসে ছিল ঢ্যাঙা সর্দারটা। হঠাৎ তার কী মনে হওয়ায় আমাদের পাশ থেকে উঠে গিয়ে কঙ্কালটার সামনে দাঁড়াল। তারপর কাঁধ থেকে বন্দুক খুলে নিয়ে তা দিয়ে কঙ্কালটার পাশে পড়ে থাকা জিনিসপত্রগুলো ঘাঁটতে থাকল।

ডা. নাসের তা দেখে আলতুনিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কী খুঁজছে ওখানে?'

'হয়তো ভাবছে ওর কাছে সোনা-টোনা পাওয়া যেতে পারে।' হেসে উত্তর দিল আলতুনিয়া।

কিন্তু তার কথা শেষ হতে-না-হতেই হঠাৎ চিৎকার করে দু-পা পিছিয়ে এল ঢ্যাঙা লোকটি। সবাই চমকে তাকালাম সেদিকে। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর লোকটির হাত দুয়েক দূরে ফুট পাঁচেক উচ্চতায় শূন্যে দুটো ছোট্ট আলোর বিন্দু চোখে পড়ল। অন্ধকারের মধ্যে সে দুটো জ্বলছে। আস্তে আস্তে দৃশ্যটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারলাম। লোকটির সামনে ল্যাজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুচকুচে কালো একটা সাপ। তার চোখ দুটোই অন্ধকারে চুনির মতো জ্বলছে। লোকটি বা সাপটা কেউই নড়ছে না।

BanglaBook.org

দু-জনেই চেয়ে আছে দু-জনের দিকে। আমরাও সকলে সেদিকে তাকিয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে গেলাম। শুধু আলতুনিয়া আস্তে আস্তে কোমর থেকে তার রিভলভারটা টেনে বার করল। আরও কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপরই হঠাৎ সাপটা লাফিয়ে পড়ল লোকটির গায়ে। একটা মৃদু ঝটাপটির পর বীভৎস চিৎকার করে কাটা কলা গাছের মতো দুম করে মাটিতে পড়ে গেল লোকটি। তার দেহ ছেড়ে সরসর করে ঘরের উলটো দিকে ছুটে গেল সাপটা।

এবার প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করে উঠল আলতুনিয়ার হাতের রিভলভার। ধোঁয়ায় ভরে গেল আমাদের সামনেটা। মাথার উপর থেকে খসে পড়ল ধুলোবালি। ধোঁয়া কাটতেই দেখি, মাটির উপর ছড়িয়ে আছে সাপটার শরীরের ছিন্নভিন্ন অংশ। আলতুনিয়ার একজন সঙ্গী দেওয়াল থেকে মশালটা খুলে নিয়ে এগিয়ে গেল মাটিতে পড়ে থাকা ঢ্যাঙা লোকটির কাছে। আমরাও এগিয়ে গেলাম সেখানে। কিন্তু যাযাবর সর্দারের শরীর মুহূর্তের মধ্যেই যেন পাথরের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছে। সারা মুখ তার নীল, বিস্ফারিত চোখ দুটো তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। তার প্রাণপাখি যে বেরিয়ে গিয়েছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না। সামনে বসে তার সঙ্গী যাযাবরটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মশালের আলোয় আর-একটা জিনিস আমাদের চোখে পড়ল। কঙ্কালটার পাশেই নানা আবর্জনার মধ্যে পড়ে রয়েছে গোটা দশেক ডিম। আসলে সাপটা তার নিজের বাসায় যাযাবর সর্দারের অনধিকারচর্চা পছন্দ করেনি। তাই তাকে আক্রমণ করেছিল। আলতুনিয়া শুধু বলল, 'ভয়ংকর বিষধর সাপ, স্যান্ড ভাইপার আর আফ্রিকার বিখ্যাত ব্ল্যাক মাম্বার সংকর। কামড়ালেই মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য।'

কিছুক্ষণ পর আলতুনিয়ার এক সঙ্গী কঙ্কালটার পাশে একইভাবে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল যাযাবর সর্দারের শরীরটাকেও। তার বন্দুকটা অবশ্য লোকটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। এবার আমরা ঢুকলাম নতুন সুড়ঙ্গপথে। কিন্তু আমার যেন কেন মনে হল, ইচ্ছে করলে সাপটা কামড়াবার আগেই আলতুনিয়া গুলিটা করতে পারত। যাযাবর সর্দারকে সঙ্গে আনার ইচ্ছে তার ছিল না সম্পদের বখরা দেওয়ার ভয়ে। তাই আলতুনিয়া কৌশলে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল।

BanglaBook.org

১৩

আবার চলতে লাগলাম আমরা। সুড়ঙ্গ কখনো নীচের দিকে নেমেছে, আবার কখনো উপর দিকে উঠেছে। কখনো এগিয়েছে একদম সোজা, কখনো বা এগিয়েছে সাপের মতো এঁকেবেঁকে। মাঝে মাঝে পথের দু-পাশ থেকে বেরিয়েছে আরও নানা সুড়ঙ্গ। হয়তো সেগুলো গিয়ে শেষ হয়েছে মরুভূমির কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে, অথবা চলে গিয়েছে কোনো অনাবিস্কৃত সমাধিতে। যেখানে হয়তো যুগ যুগ ধরে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যাওয়া কোনো ফ্যারাও বা তাঁর রানি। হয়তো তাঁরা আরও অনেক বছর একইভাবে শায়িত থাকবেন, যত দিন না কোনো প্রত্নবিদ-গবেষক বা সমাধিচোরের দল গিয়ে হাজির হয় সেখানে। সুড়ঙ্গের মধ্যে মাঝে মাঝে ছাদ থেকে পাথর খসে গিয়ে রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পাথর সরিয়ে বা হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হচ্ছে আমাদের। মাঝে মাঝে একটু প্রশস্ত জায়গা পেলে মিনিট দশেকের জন্য বিশ্রাম। কখনো তার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা জল খাওয়া। মৃত যাযাবর সর্দারের কাছে একটা জলের বোতল ছিল। দয়া করে আলতুনিয়া সেটা দিয়েছে ডা. নাসেরের হাতে। এবং তার সঙ্গে এও বলে দিয়েছে যে, ওই এক বোতল জলেই আমাদের তিন জনকে চালিয়ে নিতে হবে। তারা আর এক বিন্দু বাড়তি জল দেবে না আমাদের। কারণ, জল এখানে সোনার চেয়েও দামি।

আমি ডা. নাসেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

ডা. নাসের বললেন, 'ঠিক কোথায় যাব তা বলা যাবে না। তবে আলতুনিয়া আমাদের প্রথমে নিয়ে যাবে হাটশেপসুটের মরচুয়ারির কাছাকাছি।'

চলতে চলতে বুঝতে পারলাম সাপের কামড়ে যাযাবর সর্দারের মৃত্যুর পর আলতুনিয়ার সঙ্গীরা কেমন যেন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। একটু খসখস শব্দ শুনলেই তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। হাতের মশাল মাথার উপর তুলে দেখবার চেষ্টা করছে, শব্দের উৎসটা কী? সাপ নয় তো! ব্যতিক্রম একমাত্র আলতুনিয়া। তার কোনো ভয় বা বিকার নেই। খোশমেজাজে চলছে সে, মাঝে মাঝে সঙ্গীদের দরকারি নির্দেশ দিচ্ছে। আর আমরা কোনো চালাকি

BanglaBook.org

করলে যে আমাদের তিন জনের ভয়ংকর বিপদ ঘটবে, তা মনে করিয়ে দিচ্ছে ডা. নাসেরকে। এমনকী, দু-একবার তাকে শিস দিতেও শুনলাম। আলতুনিয়া যে ঠান্ডা মাথার কত বড়ো শয়তান তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না।

অংশু কোনো কথা বলছিল না। আমার আর ডা. নাসেরের মাঝে হাঁটছিল। আলতুনিয়ার সঙ্গে সকলের প্রথমে যে হাঁটছিল, অনেক সময় সে বাঁক নিলে তার পিছনের দিক অর্থাৎ আমাদের অংশটা কয়েক মুহূর্তের জন্য জমাটবাঁধা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। এমনই সে অন্ধকার, নিজের হাত-পা পর্যন্ত চোখের সামনে থেকে মুছে যাচ্ছে। অংশু যাতে আগের দিনের মতো পথের দু-পাশের কোনো অন্ধকার সুড়ঙ্গে আচমকা ঢুকে না পড়ে, তাই অন্ধকার হলেই আমি তার কাঁধ ধরছিলাম। বার কয়েক তার কাঁধ ধরার পর অংশু মনে হয় ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল। তাই সে চলতে চলতে মৃদু প্রশ্ন করল, 'তুমি আমার কাঁধ চেপে ধরছ কেন?'

আমি বললাম, 'পাছে তুমি হারিয়ে যাও তাই।'

আমার কথা শুনে অংশু বলল, 'আমি এখানে হারাব না, আমি সব চিনতে পারছি, আমার শুধু ভয় করে আনুবিসকে। কিন্তু আমি জানি, ও এখানে নেই। ও আছে মরচুয়ারি মন্দিরে।'

BanglaBook.org

অংশুর কথাগুলো শুনে আমার খুব আশ্চর্য লাগল। আমি আবার তাকে প্রশ্ন করলাম, 'কাল বিকেলে মরচুয়ারি মন্দিরের নীচে হঠাৎ তুমি সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকলে কেন? সে সুড়ঙ্গটা কি তুমি চিনতে পেরেছিলে?'

অংশু বলল, 'না। আমার মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাকে ডাকছে ওর ভিতর থেকে। তাই আমি ঢুকে পড়লাম ভিতরে। কিন্তু ওর ভিতরে ঢোকার পর ডাকটা শুধু দূরে সরে যাচ্ছিল। আমিও তাই সুড়ঙ্গের ভিতরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর কী হল আমার মনে নেই।' এই বলে চুপ করে গেল সে।

সারাদিন কেটে গেল সুড়ঙ্গপথে চলতে চলতে। একসময় এসে হাজির হলাম বিশাল এক গুহার মধ্যে। অনেক উঁচুতে তার ছাদ। কথা বললে প্রতিধ্বনি হচ্ছে। দেখে মনে হল গুহাটা কৃত্রিম নয়, প্রাকৃতিক। অসংখ্য সুড়ঙ্গ নানা দিকে চলে গিয়েছে সেখান থেকে। আলতুনিয়া জানাল, আমরা

এখন ভ্যালি অফ কিংসের নীচে অবস্থান করছি। হাটশেপসুটের মরচুয়ারি মন্দির আর খুব বেশি দূরে নয়। সুড়ঙ্গপথে সেখানে পৌঁছোতে ঘণ্টা চার-পাঁচেক সময় লাগবে। এই গুহাতেই রাত কাটাব আমরা। তারপর ভোরবেলা যাত্রা করব সেদিকে। হঠাৎ আমার হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই দেখি, বিকেল পাঁচটা বাজে। অর্থাৎ আমরা নিখোঁজ হওয়ার পর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। আমার শুধু মনে হচ্ছিল ডা. ঘটকের কথা। আমাদের জন্য দুর্ভাবনায় নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাচ্ছেন তিনি। ভারি খারাপ লাগছিল তাঁর কথা ভাবতে। হয়তো তাঁর সঙ্গে আমাদের তিন জনের আর দেখা হবে না। সুড়ঙ্গের মধ্যেই আলতুনিয়া আমাদের সমাধি দিয়ে দেবে। ডা. নাসেরের মুখও দেখলাম বেশ চিন্তাক্লিষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় আলতুনিয়ার হাত থেকে।

গুহার এক পাশে ছোটো-বড়ো পাথরের চাঁই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে একটা ছোটো স্তূপের মতো সৃষ্টি হয়েছে। পাথুরে দেওয়ালের একটা অংশ ধসে গিয়েছে সেদিকে। সেই পাথরের স্তূপের উপর বসলাম আমরা। আমরা তিন জন আর যাযাবরটা একজায়গায়। কিছু দূরে আলতুনিয়া আর তার তিন সঙ্গী। ইচ্ছে করেই তারা আমাদের থেকে একটু দূরে বসল শলাপরামর্শ করার জন্য। আলতুনিয়া তার সঙ্গীদের সঙ্গে চাপা গলায় কীসব কথাবার্তা বলতে লাগল। সম্ভবত তাদের আগামী কর্মপদ্ধতি নিয়ে। অংশু আমার ঠিক পাশে বসে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মশালটা গোঁজা আছে পাথরের একটা খাঁজে। তার থেকে কিছুটা আলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে ঠিকরে, কিন্তু গুহার প্রত্যন্ত প্রান্তগুলোতে বিরাজ করছে জমাটবাঁধা অন্ধকার। আমাদের পাশে বসা যাযাবরটা তার সর্দারের মৃত্যুর পর থেকেই বেশ ম্রিয়মাণ। তারপর সারাটা পথ একবারের জন্যেও তার মুখ থেকে একটাও শব্দ শোনা গেল না। আসার সময় যেখানে যেখানে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আমরা থেমেছি, সেখানে আমি প্রত্যেকবারই লক্ষ করেছি, লোকটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাকিয়ে আছে আলতুনিয়ার দিকে। সম্ভবত সেও বুঝতে পেরেছে যে, আলতুনিয়া ইচ্ছে করেই তাঁর সর্দারকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। এরপর হয়তো তার পালা!

আলতুনিয়া হঠাৎ ডা. নাসেরকে বলল, 'কাল মরচুয়ারি মন্দিরের নীচে

BanglaBook.org

পৌঁছোবার পর সমাধিকক্ষ খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিজ আপনারা। যেভাবেই হোক আপনি খুঁজে বের করবেন সেটা।'

ডা. নাসের বললেন, 'চেষ্টা করব।'

আলতুনিয়া এবার বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে বলল, 'না, না, চেষ্টা নয়। আপনাকে খুঁজে বের করতেই হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি তার সন্ধান পেয়েছেন প্যাপাইরাস থেকে।'

'যদি পৌঁছোতে না পারি?' শান্ত গলায় বললেন ডা. নাসের।

'তাহলে আপনাদের তিন জনের কেউই আর পৃথিবীর আলো দেখতে পাবেন না। আপনাকে আমি এমন যন্ত্রণা দিয়ে মারব যে, মৃত্যুর পর আপনার আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, যুগ যুগ ধরে সে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে। আপনার আর আমার মধ্যে অনেক পুরোনো একটা দেনাপাওনা বাকি থেকে গিয়েছে। সেটা আমি সুদসহ ফিরিয়ে দেব আপনাকে।'

'কীসের দেনাপাওনা?' ডা. নাসেরের গলায় এবার বিস্ময়ের সুর ফুটে উঠল!

'আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে গিজাতে আপনি যে খুনটা করেছিলেন, আমি তার পাওনা মেটাবার কথা বলছি।' কর্কশ গলায় বলল আলতুনিয়া।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকালাম ডা. নাসেরের দিকে। তাহলে তিনিও কি সত্যিই একজন খুনি! ডা. নাসেরকে এবার যেন কেমন ম্রিয়মাণ দেখাল। তিনি আলতুনিয়াকে প্রশ্ন করলেন, 'সে ঘটনার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?'

আলতুনিয়া তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। মশালের আলোয় দেখতে পেলাম, তার মুখ মুহূর্তের মধ্যে বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে চিৎকার করে বলল, 'কীসের সম্পর্ক! আপনি যাকে খুন করেছিলেন, সেই আলতাফ হোসেন আমার দাদা ছিল।'

আলতুনিয়া এত জোরে চিৎকার করল যে, অংশু ভয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ডা. নাসের এবার বললেন, 'না ওটা খুন নয়, ওটা একটা দুর্ঘটনা। যদিও তার জন্য আমি আজও আমার ভাগ্যকে দোষারোপ করি। আলতাফ বরাবরই ছিল উগ্র প্রকৃতির। গিজায় স্ফিংক্সের নাক লক্ষ করে

BanglaBook.org

নিশানা-বাজিতে আমাদেরই এক সঙ্গীর কাছে হেরে যায় সে। তার পরেই মেজাজ হারিয়ে আমার হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে সেই সঙ্গীকে গুলি করতে যায়। তখনই ধস্তাধস্তির সময় বন্দুকের গুলি ছিটকে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। সেদিন যারা ঘটনাস্থলে হাজির ছিল আদালতে তারা এ কথাই বলেছিল। যে কারণে আদালতও আমাকে মুক্তি দেয়।'

আলতুনিয়া আবার চিৎকার করে বলল, 'ওসব আদালত আমি মানি না। আমার আদালতে এখনও আপনার বিচার বাকি আছে। আমাকে যদি জায়গামতো পৌঁছে দিতে না পারেন তাহলে দেখবেন কী হয়! যে হাতে আপনি বন্দুক ধরতেন, আপনাকে মারবার আগে সে হাতের আঙুলগুলো একটা-একটা করে কেটে নেব।'

তার কথা শুনে ডা. নাসের কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই আলতুনিয়া কোমরের খাপ থেকে রিভলভার বের করে ডা. নাসেরের দিকে উঁচিয়ে বলল, 'চুপ করুন। আর একটা কথা বললে এখনই আপনাকে সমাধিতে পাঠিয়ে দেব।'

ডা. নাসের আর কোনো কথা বললেন না। চুপচাপ ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আলতুনিয়া তার রিভলভারটা কোমরের খাপে রেখে কাঁপতে কাঁপতে আবার বসে পড়ল।

BanglaBook.org

আরও ঘণ্টাখানেক একইভাবে কেটে গেল। মশালের আলোটা ক্রমে কমে আসছে। অংশুকে দেখলাম, ঢুলতে শুরু করেছে। ঠিক এমন সময় আমাদের পাশে বসা যাযাবরটা হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। হয়তো তার মনে পড়ছে সর্দারের কথা। আলতুনিয়া এতক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল। কান্না শুনে সে লোকটিকে দুর্বোধ ভাষায় কী যেন বলল। লোকটি কিন্তু চুপ করল না। দু-হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে কেঁদেই চলল। বরং তার কাঁদার শব্দ যেন একটু বেড়ে গেল। আমি দেখলাম, আলতুনিয়ার চোখ-মুখে ক্রমশ বিরক্তি ফুটে উঠছে। সে লোকটিকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু লোকটি তার কথার কোনো উত্তর দিল না। একইভাবে বসে রইল। আলতুনিয়া তার পাশের সঙ্গীকে এবার একটা ইশারা করল। তার সেই সঙ্গী ছোটো একটা পাথর কুড়িয়ে নিল এবং লোকটিকে থামাবার জন্যই মনে হয় পাথরটা ছুড়ে মারল লোকটির দিকে। ঠিক সেই সময় লোকটি তার মাথাটা তুলল হাঁটুর

ফাঁক থেকে। পাথরটা লাগল ঠিক তার নাকের উপর। গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল। যে লোকটি পাথর ছুড়ে মেরেছিল সেও যেন হতভম্ব হয়ে গেল তা দেখে।

এর পর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। যাযাবরটা পিঠ থেকে তার রাইফেলটা বিদ্যুৎগতিতে খুলে নিয়ে গুলি চালিয়ে দিল আলতুনিয়ার সেই সঙ্গীকে লক্ষ করে। গুলিটা সটান গিয়ে লাগল তার পেটে। লোকটি বিকট চিৎকার করে পাথরের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। ব্যাপারটা কী হল বুঝে উঠতে মনে হয় কয়েক মুহূর্ত লাগল। তার পরেই আলতুনিয়া এবং তার অপর সঙ্গী কোমর থেকে রিভলভার খুলে নিয়ে গুলি চালিয়ে দিল যাযাবরটাকে লক্ষ করে। ইতিমধ্যে যাযাবরটা আরও একবার তার ট্রিগার টেনে দিয়েছে। একসঙ্গে এত আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনে কানে তালা লেগে গেল। ধোঁয়ায় ঢেকে গেল আমাদের সামনেটা। তারপর ঘটল সেই ভয়ংকর ঘটনাটা। হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠল চারদিক এবং ঠিক মাথার উপর থেকে একটা বিশাল পাথরের চাঁই ভেঙে পড়ল আমাদের আর আলতুনিয়ারা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার মাঝখানে। ধুলোর ঝড় উঠল চারদিকে। ডা. নাসের মুহূর্তের মধ্যে কী একটা জিনিস মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আমার হাত ধরে বললেন, 'চলো পালাই!'

আমরা যেখানে বসে ছিলাম তার ডান দিকেই ছিল একটা সুড়ঙ্গ-গহ্বর। অংশুকে কোনোরকমে জাপটে ধরে ডা. নাসেরের পিছন পিছন আমি ঢুকে পড়লাম সুড়ঙ্গের মধ্যে। ঠিক তখনই আমাদের পিছনে গুহার মধ্যে মশালের আলোটা নিভে গেল। কার যেন একটা বীভৎস আর্তনাদও আমার কানে এল। তারপর অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে অংশুকে নিয়ে ছুটতে শুরু করলাম আমরা।

১৪

ঘন্টাখানেক পরে আমরা থামলাম। অন্ধকারের মধ্যে চলতে চলতে কতবার যে সুড়ঙ্গের পাথুরে দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়েছি তার কোনো হিসেব নেই। কপাল ফুলে গিয়েছে, বোধ হয় রক্তও বেরিয়েছে। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারলাম না। কনুইয়ের কাছেও বেশ জ্বালা করছিল। অংশুও চলতে চলতে

BanglaBook.org

বেশ কয়েকবার ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছে। কিন্তু তবুও থামিনি আমরা, পাছে আলতুনিয়া আমাদের ধরে ফেলে এই ভয়ে।

থামবার পর ডা. নাসের বললেন, 'যতটা পথ এসেছি তাতে আলতুনিয়া আর আমাদের নাগাল পাবে বলে মনে হয় না।'

আমি তাঁর কথা শুনতে পেলেও অন্ধকারের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলাম না। জমাট অন্ধকারের মধ্যে এতটা পথ কীভাবে এলাম তা আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারটাই একটা দুঃস্বপ্ন। আমি অংশুর হাতটা চেপে ধরে অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠিক সেই সময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে ডা. নাসেরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?'

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখান থেকে বের হব কী করে?'

ডা. নাসের বললেন, 'একটু দাঁড়ান, আলোটা জ্বালিয়ে নিই।'

আমি বললাম, 'আলো! আপনি আলো পাবেন কোথা থেকে?'

অন্ধকারের মধ্যেই তিনি বললেন, 'গুহার ভিতর পাথরের চাঁইটা আছড়ে পড়ার সময় কারোর হাত থেকে একটা মশাল ছিটকে আমার সামনে পড়েছিল। পালাবার সময় মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। আমার পকেটে একটা দেশলাই সবসময় থাকে, সেটা দিয়েই এখন মশাল জ্বালাব।'

কিছুক্ষণের পর একটা দেশলাইকাঠি ফস করে জ্বলে উঠল আর তারপরেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল মশালটা। অন্ধকার কেটে গিয়ে সুড়ঙ্গের বেশ কিছুটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠল। প্রথমে আমি দেখতে পেলাম ডা. নাসেরের মুখ। তাঁর কপাল ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। পোশাকও ছিঁড়ে গিয়েছে বেশ কয়েক জায়গায়। তারপর তাকালাম অংশুর দিকে। দেখলাম, তার চোখ বন্ধ। আমার মনে হল, একটানা চলার পর সে এখানে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডা. নাসের বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের চলবে না। ঘণ্টা তিনেক এই মশালের আলো জ্বলবে। তার মধ্যেই যেভাবে হোক একটা পথ আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। ছেলেটা যদি আর হাঁটতে না পারে তাহলে আমি ওকে কোলে তুলে নিচ্ছি।'

আমি বললাম, 'না, না। আপনাকে নিতে হবে না, আমিই নিচ্ছি।'

BanglaBook.org

এই বলে অংশুকে কোলে তুলে নেওয়ার আগে আমি একবার তার নাম ধরে ডাকলাম। আর সঙ্গেসঙ্গেই চোখ মেলল সে। আমি তাকে বললাম, 'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?'

অংশু উত্তর দিল, 'না। আমি চোখ বুজে মনে করবার চেষ্টা করছিলাম মরচুয়ারি মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা কোনটা।'

আমার মনে হল, অংশুর কথাগুলো কেমন জড়ানো জড়ানো। একটা ঘোরের মধ্যে থেকে যেন সে কথাগুলো বলল। তাঁর কথা শুনে ডা. নাসের একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি অংশুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের আরও এগোতে হবে। তুমি কি হাঁটতে পারবে?'

অংশু বলল, 'পারব,' এই বলে সে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল।

এই সুড়ঙ্গটা তুলনামূলকভাবে চওড়া। পাশাপাশি স্বচ্ছন্দে দু-জনে হাঁটা যায়। দেওয়ালও মসৃণ বললেই চলে। কিছুক্ষণ চলার পর ডা. নাসের বললেন, 'না। মশালটা এভাবে জ্বালিয়ে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। আমরা বরং মশালটা নিভিয়ে দেওয়ালের গায়ে হাত ছুঁইয়ে চলি। তাতে অন্ধকারে চলার গতি কম হলেও মশালটা আমরা দরকারের সময় ব্যবহার করতে পারব।'

মশাল নিভিয়ে দেওয়া হল। অংশুকে আমাদের দু-জনের মাঝে রেখে দেওয়াল ছুঁয়ে চলতে শুরু করলাম। ডা. নাসের মশালটা তাঁর মাথার উচ্চতায় ধরে আছেন। ছাদ যেখানে অনেক নীচুতে নেমে এসেছে, সেখানে মশালটা যখনই ছাদের সঙ্গে ঠোক্কর খাচ্ছে তখনই ডা. নাসের সাবধান করে দিচ্ছেন আমাকে। মনে হল অনন্তকাল ধরে হেঁটে চলেছি এই অন্ধকার পথ ধরে। এ চলার বিরাম নেই। শেষে একসময় থামলাম। ডা. নাসের আবার মশালটা জ্বালালেন। দেখলাম, বিরাট বড়ো একটা হলঘরের ভিতর দাঁড়িয়েছি আমরা।

ডা. নাসের বললেন, 'এবার আমরা ঘণ্টা পাঁচেকের জন্য বিশ্রাম নেব। কারণ, সুস্থ থাকার জন্য এটা এখন অত্যন্ত জরুরি। আমাদের হয়তো আরও অনেক পথ চলতে হবে। যদিও জানি না এই সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীর আলো শেষ পর্যন্ত দেখতে পাব কি না!'

আমি অংশুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার চোখের পাতা বন্ধ। আমি তার নাম ধরে ডাকলাম, কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। তাকে মাটির উপর

BanglaBook.org

আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলাম। ডা. নাসের আমাকেও শুয়ে পড়তে বললেন। কিন্তু আমার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল এই অন্ধকার জগৎ থেকে আর মুক্ত হতে পারব না। মৃত্যুভয় চেপে বসতে লাগল আমার উপর। আমি বসে বসে চিন্তা করতে লাগলাম ডা. ঘটকের কথা, আমার

ছেলেবেলার কথা, প্রিয়জনের কথা।

ডা. নাসের মশালটা হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে চারপাশটা দেখছিলেন। বেশ কয়েকটা সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে ঘরের নানা দিক থেকে। সেগুলোর মধ্যে উঁকি মারছিলেন তিনি। হঠাৎ শুনতে পেলাম ডা নাসেব বললেন, 'মি সেন, একবার এদিকে আসুন।'

BanglaBook.org

ডা. নাসের দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা সুড়ঙ্গের সামনে। আমি গিয়ে সেখানে দাঁড়াতেই ডা. নাসের মশালটা মাথার উপর উঁচু করে ধরে সুড়ঙ্গে ঢোকার মুখের উপরের দেওয়ালে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

ভালো করে দেখার পর মনে হল, সেখানে দেওয়ালের গায়ে যেন কিছু খোদাই করা। কিন্তু তার প্রায় সবটুকুই ধুলোবালিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। জায়গাটা মাটি থেকে ফুট দশেক উঁচুতে। মাটিতে দাঁড়িয়ে ছোঁওয়া যাবে না।

ডা. নাসের আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি মাটিতে বসে পড়ছি, আপনি আমার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে ধুলোবালি পরিষ্কার করুন।' এই বলে তিনি মশালটা আমার হাতে দিয়ে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে মাটির উপর বসে পড়লেন। আমি তাঁর পিঠে দাঁড়াবার আগে একটু ইতস্তত করতে লাগলাম। তা দেখে তিনি নির্দেশের সুরে বললেন, 'এখন ভদ্রতা রক্ষার সময় নয়, যা বলছি তাই করুন।'

আমি উঠে পড়লাম তাঁর পিঠের উপর। তারপর হাত দিয়ে ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল ছবিটা। খোদাই করা ছবিটা খুব বেশি হলে দশ ইঞ্চি বাই কুড়ি ইঞ্চি মাপের। দেখে মনে হল, সেটা আসলে একটা ফলক। তাতে একজন ফ্যারাওয়ের পাশে দু-জন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের একজন কুকুরমুখী মৃত্যুর দেবতা আনুবিস, আর একজন বাজপাখির মাথা, মানুষের শরীরধারী আকাশের দেবতা হোরাস। আমি পিঠ থেকে নামার পর ডা. নাসের বেশ কিছুক্ষণ ছবিটা দেখলেন। তারপর বললেন, 'এ ছবিটা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আমরা সম্ভবত হাটশেপসুটের মরচুয়ারি মন্দিরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। মরচুয়ারি মন্দিরে এ জাতীয় বেশ কিছু ছবি আছে। আনুবিস মৃত আত্মার শেষ বিচার করেন। আর হোরাস বিচারের পর আত্মাকে নিয়ে অনন্তলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেন। একমাত্র মরচুয়ারি মন্দিরেই আনুবিস ও হোরাসকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। আমার মনে হয় এ ছবিতে তাঁদের দু-জনের মাঝখানে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আর কেউ নন, রানি হাটশেপসুট।'

আমি এবার তাকালাম ডা. নাসেরের চোখের দিকে। দেখলাম, তাঁর চোখ

BanglaBook.org

দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হয়তো এই সুড়ঙ্গ শেষ পর্যন্ত আমাদের পৃথিবীর আলো দেখাবে।'

এরপর মশাল নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা।

ডা. নাসের যখন ঘুম ভাঙালেন তখন আমার ঘড়িতে ঠিক পাঁচটা বাজে। বাইরের পৃথিবীতে নিশ্চয়ই এতক্ষণে আলো ফুটে গিয়েছে। কিন্তু তার চিহ্নমাত্র নেই এই পাতালপুরীতে। চারপাশে শুধু জমাট অন্ধকার। ডা. নাসের মশালটা আবার কিছুক্ষণের জন্য জ্বালালেন। অংশুর ঘুম ভাঙিয়ে কয়েক ঢোক জল খাওয়ালাম। আমরাও মুখে দিলাম কয়েক ফোঁটা। অংশুকে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সাহস দেওয়ার জন্য বললাম, 'তোমার কোনো ভয় নেই। আজই আমরা এখান থেকে বাইরে বের হব।'

সে আমার দিকে একবার তাকাল মাত্র। কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। ডা. নাসের মশালটা নিভিয়ে দিলেন। অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে আবার শুরু হল আমাদের যাত্রা।

একটার পর একটা সুড়ঙ্গপথ বেয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। ঘড়ির কাঁটাও ঘুরতে লাগল সেই সঙ্গে। মাঝে মাঝে কিছু সময় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামছি। মুখে দিচ্ছি কয়েক ফোঁটা করে জল। জলও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমি আর ডা. নাসের গায়ের জামাগুলো ছিঁড়ে লম্বা লম্বা ফালি করে নিয়েছি মশালের উপর জড়ানোর জন্য, যাতে মশালটা বেশি সময় ধরে জ্বলে। ডা. নাসের মাঝে মাঝে মশালটা জ্বালাচ্ছেন পথের দিশা ঠিক করে নেওয়ার জন্য। আমি আর অংশু তাঁকে অনুসরণ করছি। অংশু কোনো কথা বলছে না। মনে হচ্ছে, সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে।

বেলা দশটা নাগাদ আমরা একটা বিরাট হলঘরে ঢুকলাম। ডা. নাসের মশালটা জ্বালালেন সেখানে। সারা ঘরের দেওয়াল জুড়ে নানা ধরনের সব ছবি আঁকা। সে ঘর থেকে আরও দুটো সুড়ঙ্গ দু-দিকে বেরিয়েছে। ডা. নাসের মশাল জ্বালিয়ে দেওয়ালগুলো দেখতে দেখতে একজায়গায় এসে থামলেন। সেখানে একটা হাইয়ারোগ্লিফিক বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখার পর তিনি আমাকে ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে রাখা প্যাপাইরাসটা বের করতে বললেন। দেওয়ালের গায়ের হাইয়ারোগ্লিফিকের সঙ্গে ডা. নাসের

BanglaBook.org

সেটা মেলাতে লাগলেন এক মনে। কিছুক্ষণ পর তিনি নিজের মনেই বললেন, 'না, এসবের পিছনে সময় নষ্ট করা এখন আর উচিত হবে না। সময় এখন অত্যন্ত মূল্যবান।' এই বলে তিনি প্যাপাইরাসটা আবার গোটাতে শুরু করলেন।

'কী লেখা আছে দেওয়ালে?' আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম।

ডা. নাসের মৃদু হেসে বললেন, 'যে সমাধির সন্ধানের জন্য আলতুনিয়া আমাদের ধরেছিল, ড. হান্স সম্ভবত যে সমাধির সন্ধান করছেন, সব চেয়ে বড়ো কথা, যে সমাধির সঙ্গে অংশুর অসুখের একটা অদৃশ্য যোগসূত্র আছে বলে মনে হয়, সেই সমাধির কাছে যাওয়ার রাস্তা এই ঘরেই কোথাও লুকোনো আছে। কিন্তু তা খুঁজে বের করার সময় ও রসদ এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। এখন আমাদের প্রথম কাজ হল, এই অন্ধকার পৃথিবী থেকে মুক্তি পাওয়া। প্রাণ নিয়ে বাইরে যেতে পারলে ভবিষ্যতে একদিন হয়তো এখানে ফিরে আসতে পারব। তবে এ ঘরে পৌঁছোবার পর একটা জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি মরচুয়ারি মন্দিরের নীচে অথবা খুব কাছাকাছি কোনো জায়গায়। মুক্তির পথ এবার আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।'

আমরা যে সুড়ঙ্গ দিয়ে ঘরে ঢুকেছি সেটা ছাড়া ঘরের উলটো দিকের দেওয়াল থেকে আরও দুটো সুড়ঙ্গপথ বেরিয়েছে। সুড়ঙ্গ দুটোর মুখে মশালের আলো ফেলে যতটুকু বোঝা গেল, তার একটা ঢালু হয়ে আরও মাটির গভীরে নেমে গিয়েছে, আর-একটা উপর দিকে উঠে গিয়েছে। যে সুড়ঙ্গটা উপর দিকে উঠেছে সে পথেই যাবেন বলে মনস্থির করলেন ডা. নাসের, হয়তো সে পথে উঠে পৃথিবীর আলো দেখা যেতে পারে এই আশায়। আমরা যখন সেই সুড়ঙ্গে ঢুকতে যাচ্ছি, ঠিক তখনই সুড়ঙ্গে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে ঘাড় নাড়তে শুরু করল অংশু। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি কিছু বলবে?'

সে উত্তর দিল না, শুধু প্রবলভাবে ঘাড় নাড়তে লাগল। দেখলাম, তার দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে। আমি আবার তাকে একই প্রশ্ন করলাম। কিন্তু মনে হল আমার কথা যেন তার কানে যাচ্ছে না।

ডা. নাসের আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে এ সুড়ঙ্গপথ দিয়ে

BanglaBook.org

কি বাইরে যাওয়া যাবে না! ও কি সে কথাই বলছে ঘাড় নেড়ে? আচ্ছা, তাহলে আর একটা সুড়ঙ্গ দেখা যাক। হয়তো ও-ই আমাদের শেষ পর্যন্ত মুক্তির রাস্তা দেখাবে।'

আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম, যে সুড়ঙ্গটা নীচের দিকে নেমে গিয়েছে তার ঢোকার মুখে। কিন্তু তার ঢোকার মুখে দাঁড়িয়েও অংশু একই রকমভাবে ঘাড় নাড়তে লাগল। আমি তাকে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করলাম, সে কি কিছু বলতে চাইছে? কিন্তু আগের মতোই কোনো উত্তর পেলাম না। কয়েক মিনিট আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে।

ডা. নাসের তারপর বললেন, 'আমার মনে হয় আসলে প্রচণ্ড পরিশ্রমে আর খিদে-তেষ্টায় ও বিকারগ্রস্ত হয়েছে। আমরা বরং যে সুড়ঙ্গ উপর দিকে উঠেছে সেটায় ঢুকব।' এরপর অংশুকে কিছুটা জোর করেই আমরা ঢুকলাম আগের সুড়ঙ্গটায়।

আবার শুধু চলা আর চলা। সুড়ঙ্গ বেশ কিছুটা উপর দিকে উঠে আবার নীচের দিকে নেমেছে। সে পথ নীচে নামার পর আবার উপরে উঠেছে। এভাবে উপর-নীচ করতে করতে এগোতে লাগলাম আমরা। ডা. নাসের কখনো ক্ষণিকের জন্য মশাল জ্বালচ্ছেন, আবার নিভিয়ে ফেলছেন। এক জায়গায় মশাল জ্বালতেই দেখলাম, সুড়ঙ্গের ছাদে আর দেওয়ালে নানা ধরনের ছবি আঁকা। ছবিগুলো ঘন নীল আর সোনালি রঙে আঁকা। তার মধ্যে রয়েছে ফ্যারাও, নানা দেবদেবী, পশুপাখি ইত্যাদির ছবি। এত বছর পরেও ছবিগুলো একটুও নষ্ট হয়নি। বিশেষত, সোনালি রংগুলো মশালের আলোয় ঝলমল করে উঠছে। ডা. নাসের আমার একটা ভুল ভেঙে দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন সোনালি রংগুলো আজও এত ঝলমলে কেন! আসলে ওগুলো হচ্ছে সোনার পাত, রং নয়। ছবির মধ্যে সোনার পাতগুলো বসানো আছে। সমাধিচোরের দল নিশ্চয়ই এখনও এ সুড়ঙ্গের সন্ধান পায়নি। তাহলে ওরা কবেই খুলে নিয়ে যেত এসব।'

আমি বললাম, 'তাহলে মরচুয়ারি মন্দির থেকে ওরা আমাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল কোন পথে?'

ডা. নাসের বললেন, 'এ পথে নয়, নিশ্চয়ই অন্য কোনো পথে।'

BanglaBook.org

সময় এগিয়ে চলতে লাগল, কিন্তু পথ শেষ হল না। প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল, হয়তো আর একটু এগোলেই শেষ হবে সুড়ঙ্গ, আমরা আবার পৃথিবীর আলো দেখতে পাব। বিশেষত, যেসব জায়গায় সুড়ঙ্গ উপর দিকে উঠেছে সেসব জায়গায় বারবার এই আশা জেগে উঠতে লাগল। কিন্তু উপরে ওঠার পর ভুল ভেঙে যাচ্ছিল। সুড়ঙ্গ আবার নেমে যাচ্ছিল নীচের দিকে। ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়তে লাগলাম। শরীর অবসন্ন হচ্ছে, পা যেন আর চলছে না। আমি আর ডা. নাসের দরকার ছাড়া কোনো কথা বলছি না। অংশুকে প্রশ্ন করলেও কোনো কথা বলছে না। সম্পূর্ণ ঘোরের মধ্যে দিয়ে সে হেঁটে চলেছে, ঠিক যেন দম দেওয়া একটা কলের পুতুল।

এভাবে চলতে চলতে দুপুর গড়িয়ে গেল। আমরা আর হাঁটতে পারছি না। কিছু দূর চলার পরই বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। অবশেষে বিকেল পাঁচটা নাগাদ অর্থাৎ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে আরও প্রায় সাত ঘণ্টা হাঁটার পর আমরা এসে ঢুকলাম একটা বিরাট ঘরের মধ্যে। ডা. নাসের তাঁর মশালটা জ্বাললেন। ঘরটার দেওয়ালে নানা ধরনের ছবি আঁকা। হঠাৎ মশালের আলোয় আমার নজরে পড়ল ঘরের মেঝেয় ধুলোর উপর বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ। তা দেখে আমি ডা. নাসেরকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলাম, 'এই ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার রাস্তা আছে। ওই দেখুন ধুলোর উপর মানুষের পায়ের ছাপ!'

BanglaBook.org

ডা. নাসেরের চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার কথা শুনে। তিনি নীচু হয়ে ছাপগুলো দেখবার জন্য মশালের আলো ফেললেন সেখানে। আর সঙ্গেসঙ্গেই তাঁর চোখের দ্যুতি নিভে গিয়ে সারা মুখে ফুটে উঠল গভীর হতাশা। ধীরে ধীরে সেখানেই মাটির উপর বসে পড়লেন তিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল ডা. নাসের?'

তিনি আঙুল তুলে ছাপগুলো দেখিয়ে দিলেন। ভালো করে দেখার পর আমার কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল। পায়ের ছাপগুলো আসলে আমাদেরই। ডা. নাসের মৃদুস্বরে বললেন, 'সারাদিন আমরা একই সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়িয়েছি। এ ঘরের এক দিক দিয়ে বেরিয়ে আর এক দরজা দিয়ে একই জায়গায় ফিরে এসেছি। এখন বুঝতে পারছি অংশু কেন দুটো সুড়ঙ্গের কোনোটাতেই ঢুকতে চাইছিল না! আসলে আমরা আটকে

গিয়েছি এখানে। সমাধিচোরদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য ফ্যারাওরা এ ব্যবস্থা করে রাখতেন।'

আমি আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আমরা কি কোনোদিন পৃথিবীর আলো দেখব না?'

ডা. নাসের বললেন, 'হয়তো তাই।'

তাঁর কথা শুনে আমার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পেটা শুরু হল। মনে হল, আমি এবার পাগল হয়ে যাব! আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। অংশু আমার পাশে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে আর মৃদু মৃদু দুলছে। প্রতিটি মুহূর্ত যেন অসহ্য মনে হতে লাগল।

কয়েক মিনিট পর ডা. নাসের যেন নিজেকে একটু শক্ত করে আমাকে বললেন, 'চলুন, আমরা এখন শুয়ে পড়ি। ঘণ্টা পাঁচেক পর একটা শেষ চেষ্টা করা যাবেখন। তারপর কপালে যা আছে হবে।'

তাঁর কথা শুনে আমার মনেও একটু সাহস এল। ঘরের এক কোনায় একটা পাথরের বেদি ছিল। অংশুকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে শুইয়ে দিলাম সেখানে। ডা. নাসেরের কথামতো জলের বোতলের তলায় যেটুকু জল ছিল তা ঢেলে দিলাম অংশুর গলায়। তারপর মশাল নিভিয়ে দু-জনে শুয়ে পড়লাম অংশুর পাশে। জলও নেই, আলোও প্রায় শেষ! কীভাবে বাইরে যাব আমরা! অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে এসব চিন্তা করতে করতে আবার আতঙ্ক ঘিরে ধরল আমাকে। আতঙ্ক এবং পথশ্রমের ক্লান্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

১৫

কত সময় কেটে গেল জানি না। হঠাৎ ডা. নাসেরের গলার আওয়াজ পেলাম, 'মি. সেন, উঠে পড়ুন! উঠে পড়ুন!'

সেই সঙ্গে আমার কানে এল আরও একটা শব্দ! ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ঠিক সেই সময় মশালটা জ্বালিয়ে দিলেন ডা. নাসের। বুঝতে পারলাম, অন্য শব্দটা হল অংশুর গোঙানির। বুক চেপে ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। চোখ তার বন্ধ। মুখের দু-পাশের কশ বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। কয়েক মুহূর্ত পরপর তার শরীরটা মোচড় দিয়ে উঠছে। গোঙাতে গোঙাতে মাঝে মাঝে ও যেন কী বলছে।

আমি ভয় পেয়ে ডা. নাসেরকে বললাম, 'ও কি এবার সত্যি মারা যাচ্ছে?'

ডা. নাসের আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অংশুর মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে কান পেতে ও কী বলছে শোনার চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত পর ডা. নাসের আমার দিকে মুখ করে বললেন, 'ওর একটা কথা আমি বুঝতে পেরেছি। ও বলছে, বা, আমি ফিরে এসেছি।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'বা কে?'

ডা. নাসের আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই অংশুর গলা দিয়ে একটা প্রচণ্ড চিৎকার বের হল এবং তারপর অংশু উঠে বসে চোখ মেলল। দেখলাম, তার চোখের সেই ঘোলাটে ভাবটা কেটে গিয়ে ফুটে উঠেছে একটা অন্যরকম ভাব। যে ভাবটার কোনো ব্যাখ্যা হয় না। উঠে বসার পর সে ঘরের চারপাশে একবার তাকাল ঠিকই, কিন্তু আমাদের যেন দেখতেই পেল না। পাথরের বেদি থেকে নীচে নেমে দাঁড়াল অংশু। তারপর ধীরে ধীরে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। আমি ওকে ধরতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ডা. নাসের আমাকে থামিয়ে দিলেন, ইশারায় চুপ থাকতে বললেন। অংশুর পিছন পিছন আমরাও হাঁটতে শুরু করলাম। অংশু গিয়ে দাঁড়াল দুটো সুড়ঙ্গের ঠিক মাঝখানে দেওয়ালের সামনে। তারপর দু-হাত দিয়ে দেওয়ালটা ঠেলতে লাগল। ডা. নাসের আমার হাতে মশালটা দিয়ে অংশুর দেখাদেখি ঠেলতে লাগলেন দেওয়ালটা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেওয়ালের একটা অংশ কিছুটা যেন ভিতরের দিকে ঢুকে গেল। ঠিক তার নীচ থেকে বেরিয়ে পড়ল অন্ধকার একটা গহ্বর। মশালের আলোয় দেখলাম, ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। কোনোরকমে একটা মানুষ ঢুকতে পারে তার মধ্যে।

অংশু ধীরে ধীরে ঢুকল তার মধ্যে, আমরা তার পিছন পিছন। বেশ কিছুটা নীচে নামার পর চোখে পড়ল একটা ছোট্ট কুঠুরি। তার চারদিক দিয়ে চারটে সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গিয়েছে। সেখানে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল অংশু। তারপর ঢুকল একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে। সুড়ঙ্গটা ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। দু-পাশের মসৃণ দেওয়ালে নানাধরনের ছবি আঁকা।

BanglaBook.org

মাথার ছাদও খুব নীচুতে, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। সুড়ঙ্গটা বেশ লম্বা, মিনিট পাঁচেক চলার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অংশু। দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরাও। দেখলাম, দূরে অন্ধকারের মধ্যে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সেটা দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে অংশু। ডা. নাসের আমার হাত থেকে মশালটা নিয়ে অংশুকে ছাড়িয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। তারপরেই স্পষ্ট হয়ে গেল ব্যাপারটা। সুড়ঙ্গের ভিতর আমাদের পথ আগলে বসে আছেন মৃত্যুর দেবতা আনুবিস। কালো পাথরের তৈরি মূর্তিটার সোনার চোখ দুটো মশালের আলোয় জ্বলছে। মূর্তিটা বেশি বড়ো নয়। ডা. নাসের মূর্তিটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন এক পাশে।

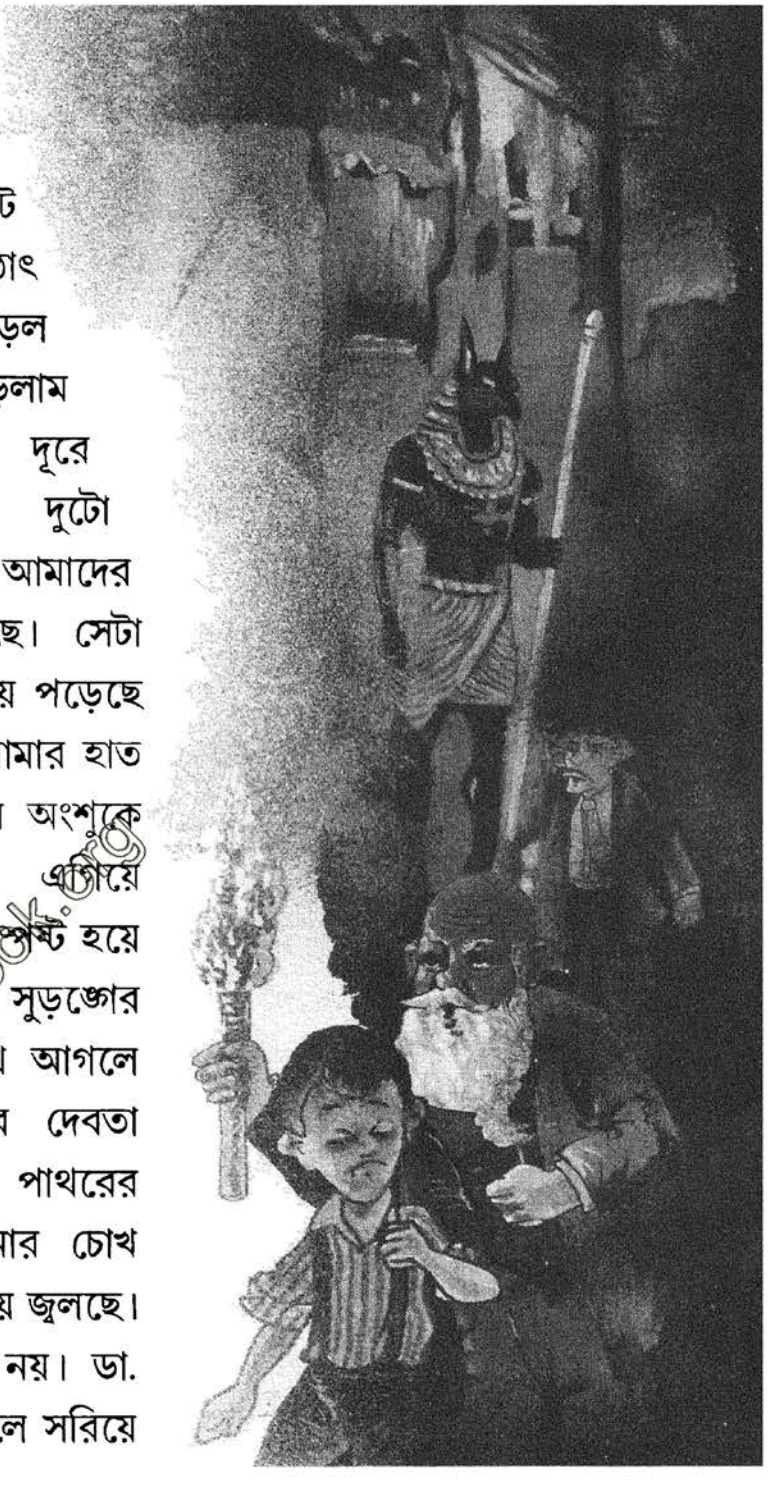

BanglaBook.org

অংশু আবার চলতে শুরু করল। মূর্তিটা ছাড়িয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর সুড়ঙ্গ ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। আরও কিছুটা এগোবার পর বেশ কয়েকটা ছোটো ছোটো কুঠুরি। কুঠুরির দেওয়ালের গায়ে আনুবিসের বিভিন্ন মূর্তি খোদাই করা। অংশুর পিছন পিছন স্লেটপাথরের কুঠুরিগুলো একে একে

পেরিয়ে আমরা এসে দাঁড়ালাম বিশাল একটা হলঘরের ভিতর। সেখানে প্রায় পাশাপাশি রয়েছেন দণ্ডায়মান আনুবিস আর হোরাসের বিশাল দুটো মূর্তি। তাঁদের দু-পায়ের ফাঁকের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা করে ফ্যারাও মূর্তি। সেই ফ্যারাও মূর্তি দুটো দেখিয়ে ডা. নাসের ফিসফিস করে বললেন, 'ওগুলো হল হাটশেপসুটের মূর্তি। হোরাস আর আনুবিসের মূর্তির মাঝে রয়েছে একটা গহ্বর। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমেছে সেই গহ্বরের ভিতর।

সেখান দিয়ে নীচে নেমে আমরা পৌঁছোলাম অদ্ভুত এক জায়গায়। কালো পাথরের তৈরি বেশ কয়েকটা ত্রিভুজ আকৃতির ঘর। প্রত্যেক ঘরের দেওয়ালের মধ্যে একটা করে কুলুঙ্গি। তার মধ্যে রাখা আছে একটা করে ছোটো আনুবিসের মূর্তি আর মুখ বন্ধ ফুলদানির মতো পাত্র। যার মধ্যে মমি তৈরির আগে মৃতদেহের অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা ভরে রাখা হত। প্রথমে ঘরে ঢোকার পর অংশু এগিয়ে গিয়ে কুলুঙ্গি থেকে পাত্রটা তুলে নিল। তারপর পরম মমতায় একবার পাত্রটার গায়ে হাত বুলিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে পাত্রটা আমার হাতে তুলে দিল। পরপর পাঁচটা ঘর থেকে পাত্র সংগ্রহ করল অংশু। আর সবকটাই পরম যত্নে আমার কাছে রাখল। ঘরগুলো পেরিয়ে অংশু এসে দাঁড়াল একটা বিরাট ঘরে। সে ঘরের দেওয়াল জুড়ে অদ্ভুত সব ছবি আঁকা। ঘরের ঠিক মাঝ থেকে ছাদ বরাবর উঠে গিয়েছে গোল পাথরের একটা স্তম্ভ। অংশু সেখানে এগিয়ে গিয়ে এমনভাবে সেটাকে ধাক্কা দিতে লাগল, যেন সে সেটাকে ঘোরাতে চেষ্টা করছে।

মশালটা দেওয়ালে গুঁজে রেখে ডা. নাসেরও অংশুর দেখাদেখি হাত লাগালেন তাতে। একটু চেষ্টা করতেই স্তম্ভটা সত্যিই একটা পাক ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের নিরেট দেওয়ালের একটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল। আমরা ঢুকলাম তার মধ্যে। মশালটা প্রায় নিভে এসেছে। তার ক্ষীণ আলোয় আমরা আর একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। সুড়ঙ্গটা বেশ চওড়া, কিন্তু শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল আমার। পায়ের নীচে পুরু ধুলোর আস্তরণ। হাজার বছরের পুরোনো ভারী বাতাস জমে আছে তার মধ্যে। সেই সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আমরা এসে দাঁড়ালাম একটা বন্ধ দরজার সামনে। দরজার গায়ে পুরু ধুলোর আস্তরণ জমে থাকলেও কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম, সেটা সোনার পাতের তৈরি। দরজার দু-পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরারত আনুবিসের

BanglaBook.org

বিশাল দুটো মূর্তি। অংশু গিয়ে দরজার গায়ে কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করল। তারপর অজানা ভাষায় কী যেন বলতে লাগল। মনে হল, সে যেন ঘরের ভিতরে কারোর উদ্দেশে কিছু বলছে। তারপর সে দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করল! ডা. নাসেরও ধাক্কা দিলেন দরজায়। কিন্তু দরজার নীচে ধুলোবালি জমে থাকায় আটকে গিয়েছে সেটা। ডা. নাসের চটপট নীচের ধুলোবালি সরিয়ে আবার ধাক্কা দিতেই পাল্লাটা খুলে গেল। আমরা ঢুকলাম আর একটা ঘরের ভিতর। সেখানে পা রাখতেই মশালটা দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

একটা মৃদু আলো ছড়িয়ে রয়েছে ঘর জুড়ে। মাথার অনেক উপরে একটা গোল ছিদ্র দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। সেই আলোয় দেখলাম, ঘরের মাঝখানে একটা ছোটো বেদির সামনে থাবা ছড়িয়ে বসে আছেন বিশাল একটা আনুবিস। চাঁদের আলোয় তার চোখ দুটো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঘরে ঢোকার পর অংশু আবার কী বলতে শুরু করল। তারপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সেই ছোট্ট বেদিটার সামনে। আমরাও গিয়ে দাঁড়ালাম সেখানে। কাছে দাঁড়াবার পর বুঝতে পারলাম, যেটাকে আমরা বেদি ভাবছিলাম সেটা আসলে একটা সারকোফ্যাগাস বা শবাধার। হাজার হাজার বছরের ধুলো জমে আছে তার চারপাশে। আমরা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই অংশু আমার দিকে তাকাল। তারপর সারকোফ্যাগাসের গায়ে ধাক্কা দিতে শুরু করল।

হঠাৎ শব্দ করে সারকোফ্যাগাসের চারদিকের আবরণ খসে পড়ল। আমাদের চোখের সামনে বেরিয়ে পড়ল ভিতরে শুয়ে থাকা একটা মমি। সেটা যে কোনো পূর্ণবয়স্ক মানুষের নয় তার আকৃতি দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না। সম্ভবত অংশুর বয়সি কারও মরদেহ হবে সেটা। ভালো করে দেখলাম, তার বুকের বাঁ দিকে একটা তীক্ষ্ণ শলাকা পোঁতা। মমিটা দেখতে পেয়েই অংশু কেমন পাগলের মতো আচরণ করতে শুরু করল। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কী যেন বলে যেতে লাগল মিনিটখানেক ধরে। আমি আর ডা. নাসের স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম তাকে। চাঁদের আলোটা ঠিক তার মুখের উপর এসে পড়েছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তার দু-চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

এরপর হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়াল আনুবিসের মূর্তিটার দিকে। চিৎকার করে

BanglaBook.org

তার উদ্দেশে কী যেন বলল। তারপর তার দিকে পিছন ফিরে কাঁপতে কাঁপতে দু-হাত দিয়ে মমির বুকে বিদ্ধ শলাকাটা টান দিয়ে খুলে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। শলাকাটা খুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝুরঝুর করে মাটির মতো ভেঙে গেল হাজার বছরের প্রাচীন সেই মমি। একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে ধুলো হয়ে যাওয়া সেই মমির উপর লুটিয়ে পড়ল অংশু। চাঁদটা ঠিক সেই সময় মাথার উপর থেকে সরে গেল। মুহূর্তের মধ্যে গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে গেল সব কিছু। আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'অংশু!' আমার হাত থেকে ফুলদানির মতো পাত্রগুলো পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমি ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলাম অন্ধকারের মধ্যে।

নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন পর অর্ধমৃত অবস্থায় আমাদের তিন জনকে উদ্ধার করলেন ড. হান্স। সৌভাগ্যক্রমে তিন জনই আবার প্রাণ ফিরে পেলাম। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে আরও দিন তিনেক সময় লাগল।

সুস্থ হয়ে ওঠার পর ড. হান্স আর ডা. ঘটকের মুখ থেকে শুনলাম আমাদের উদ্ধারের ব্যাপারটা। আমরা নিখোঁজ হওয়ার পর সুড়ঙ্গের নীচে বেশ কিছুক্ষণ আমাদের খোঁজাখুঁজি করে সেদিন উদ্বিগ্ন অবস্থায় উপরে উঠে আসেন ড. হান্স আর ডা. ঘটক। পরদিন ভোর বেলা আবার দুটো দলে ভাগ হয়ে তাঁরা মরচুয়ারি মন্দিরের নীচে ঢোকেন। একটা দলের নেতৃত্ব দেন ড. হান্স নিজে। অন্য দলের নেতৃত্ব দেন তাঁর সহকারী কার্ল। ডা. ঘটককে তাঁরা রেখে যান পাউল আর ঘালির তত্ত্বাবধানে। আমরা নিখোঁজ হওয়ার পরদিন থেকে প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন ডা. ঘটক। আমাদের এখানে নিয়ে আসার জন্য শুধু নিজেকে দোষারোপ করছিলেন। ওই তিন দিন অন্যদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও একদানা খাবারও মুখে তোলেননি তিনি।

যাই হোক, যে দুটো অনুসন্ধানকারী দল সুড়ঙ্গের নীচে নেমেছিল, তার মধ্যে কার্লের নেতৃত্বে যে দলটা ছিল তারা দ্বিতীয় দিনের মাথায় সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা গুহায় খুঁজে পায় আলতুনিয়া আর তার সঙ্গীদের মৃতদেহ। একটা বিরাট পাথরের নীচে চাপা পড়েছিল আলতুনিয়ার থেঁতলে যাওয়া মৃতদেহ। কার্লের সঙ্গে সুড়ঙ্গে ঢুকেছিল স্থানীয় এক মোটবাহক। সোনার দাঁত দেখে আলতুনিয়াকে সে শনাক্ত করে। কিন্তু তারা আমাদের সন্ধান পায়নি।

ড. হান্সের নেতৃত্বে যে দল নীচে নেমে ছিল, তারা সুড়ঙ্গে এক জায়গায়

BanglaBook.org

বালির উপর খুঁজে পেয়েছিল আমাদের তিন জনের পায়ের ছাপ। কিন্তু কিছু পরেই পাথুরে মাটিতে হারিয়ে গিয়েছিল ছাপগুলো। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ড. হান্স আমাদের সন্ধান পাননি। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যের পর দুটো দলই হতাশ হয়ে উপরে উঠে আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল আমরা আর ফিরব না। তৃতীয় দিন খুব ভোর বেলা কী একটা কারণে ঘালি গিয়েছিল সেই পাথরের আড়ালে খাদের ধারে ঝোপের কাছে, যেখানে আনুবিসের মূর্তি দেখে ভয় পেয়েছিল অংশু। হঠাৎ সে লক্ষ করল, আনুবিসের মুখটা যেন অন্য দিকে ফেরানো আছে। কাছে গিয়ে সে মূর্তিটা পরীক্ষা করতেই বুঝতে পারল, সেটা আসলে মাটির নীচে নেমে যাওয়া একটা স্তম্ভের উপরিভাগ, এবং সেটা ঘোরানো যায়। তক্ষুনি সে ফিরে এসে খবর দেয় ড. হান্সকে।

ড. হান্স এসে আনুবিসের মূর্তিটা যেখানে বসানো ছিল তার নীচে আবিষ্কার করেন এক সুড়ঙ্গপথ। দলবল নিয়ে তিনি ঢুকলেন তার ভিতর এবং গিয়ে পৌঁছোলেন মাটির নীচে গোলাকার স্তম্ভওলা সেই ঘরটায়। আসলে অংশু আর ডা. নাসের যখন সেই গোলাকার স্তম্ভটা ঘুরিয়ে দেওয়াল ফাঁক করেছিলেন তখন স্তম্ভের মাথার উপর বসানো আনুবিসের মূর্তিটাও ঘুরে গিয়েছিল। যাই হোক, সেখানে ঢোকার পর ধুলোর উপর আমাদের পায়ের ছাপ দেখে কাছেই আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে যান ড. হান্স। তারপর দুপুর নাগাদ সমাধিকক্ষের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় আমাদের খুঁজে পান তিনি।

BanglaBook.org

১৬

নীলনদের এক ক্যাটারাক্টের ধারে পার্কের মধ্যে বসে ছিলাম ডা. নাসের, আমি আর ডা. ঘটক। কিছু দূরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া নীলনদের দিকে তাকিয়ে ছিল অংশু। জলপ্রবাহ যেখানে পাথর কেটে উপর থেকে নীচে নেমেছে তাকে বলা হয় 'ক্যাটারাক্ট'। নীলনদে বেশ কয়েকটা ক্যাটারাক্ট আছে। আসোয়ান বাঁধ তৈরি হওয়ার আগে এই ক্যাটারাক্ট পেরিয়ে কেউই নদীপথে আসোয়ানের দক্ষিণে যেতে পারেনি।

আমরা আজ লাক্সর থেকে নদীপথে তিন দিনের জন্য যাত্রা করব। এ ভ্রমণকে বলা হয় 'নীলনদ ক্রুজ'। দেখব, নীলনদের তীরে অবস্থিত গ্রিকদের দু-হাজার দুশো বছরের প্রাচীন এসনার মন্দির, খ্রিস্টজন্মের অনেক আগের

তৈরি এডফু মন্দির, ফিলের মন্দির ইত্যাদি। আমাদের জাহাজ ছাড়তে বেশ কিছুটা দেরি ছিল, তাই আমরা পার্কে বসে গল্প করছিলাম। ডা. ঘটকই তুললেন ব্যাপারটা। তিনি ডা. নাসেরকে বললেন, 'আজ আপনি সম্পূর্ণ ব্যাপারটা খুলে বলুন। অংশুর অসুখের সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল ওই সমাধির? আপনার কাছে রাখা প্যাপাইরাসেই বা কী লেখা ছিল? অংশুর প্রলাপের মধ্যে এমন কী শব্দ ছিল, যাতে আপনার ধারণা হয়েছিল ওই সমাধির সঙ্গে অংশুর সম্পর্ক আছে?'

ডা. নাসের বললেন, 'আমি বলছি সেকথা, তবে তার কতটা আপনারা বিশ্বাস করবেন সে সিদ্ধান্তের ভার আমি আপনাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।'

এই বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'রানি হাটশেপসুট আর তাঁর মন্ত্রী সেনমুটের কাহিনির একটা অধ্যায় আপনারা ইতিপূর্বে আমার মুখ থেকে শুনেছেন। এবার আমি বলব ওর পরবর্তী এক অজানা কাহিনির কথা। যার সন্ধান আমি পাই আমার কাছে থাকা হাজার বছরের প্রাচীন প্যাপাইরাস থেকে। প্রসঙ্গত আপনাদের বলে রাখি যে, ড. হান্সও অনুরূপ কাহিনির সন্ধান পান ফ্রান্সের লুভর মিউজিয়ামে রাখা এক শিলালিপিতে। কিন্তু কী সেই কাহিনি? তা হল, হাটশেপসুটের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মরচুয়ারি মন্দির থেকে সুড়ঙ্গপথে সেনমুট পালিয়ে গেলেন ঠিকই কিন্তু সেনমুটের একমাত্র বংশধর তাঁর বারো বছরের নাতি আখটুম ধরা পড়ে গেল রানির সেনাদের হাতে।

'আখটুমের বাবা ছিলেন সেনমুটের একমাত্র সন্তান। হাটশেপসুটের নির্দেশে সুদানে সামরিক অভিযানে গিয়ে তিনি মরু-যাযাবরদের হাতে নিহত হন। আর সেনমুটের পুত্রবধূ আখটুমের জন্ম দিয়েই মারা যান। ভ্যালি অফ কিংসের কাছে এক গ্রামে সেনমুটের ছোট্ট প্রাসাদে বড়ো হয়ে উঠেছিল আখটুম। সেনমুট মরচুয়ারি মন্দির থেকে পালাবার সময় তার এক পার্শ্বচরকে নির্দেশ দিয়ে যান যে, সে যেন প্রাসাদ থেকে আখটুমকে নিয়ে মরুভূমির এক গোপন স্থানে তাকে সেনমুটের হাতে তুলে দেয়। এক জ্যোৎস্না রাতে সেনমুটের সেই সঙ্গীর সঙ্গে উটপাখির পিঠে চেপে নুবিয়ান মরুভূমি পার হওয়ার সময় দুর্ভাগ্যবশত ধরা পড়ে যায় আখটুম। সেনমুট এ খবর পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই মরুভূমির আরও গভীরে চলে যান, মিশে যান এক যাযাবর

BanglaBook.org

গোষ্ঠীর সঙ্গে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সেখানে নাকি আবার সংসার পাতেন বলেও শোনা যায়।

'তবে সেসব কথা থাক, আমরা ফিরে আসি আখটুমের প্রসঙ্গে। আখটুমকে বন্দি করে হাজির করা হল হাটশেপসুটের সামনে। রানি পুরোহিতদের কাছে জানতে চাইলেন এই বালককে কী শাস্তি দেওয়া যায়? রানি পুরোহিতদের চেয়ে মন্ত্রী সেনমুটকে বেশি গুরুত্ব দিতেন বলে তাঁরা সেনমুটের উপর চটা ছিলেন। তাই তাঁরা সেনমুটের চরম ক্ষতি করার সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করার পর রানিকে জানালেন, তিনি যেন আমনরার মন্দিরে হাজির হয়ে স্বয়ং তাঁর থেকেই নির্দেশ গ্রহণ করেন। রানি হাজির হলেন মন্দিরে। কিন্তু তার আগেই একজন পুরোহিত গোপনে সুড়ঙ্গপথ বেয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমনরার মূর্তির পিছনে। হাটশেপসুট মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে বলল, আখটুমের কা-ই সেনমুটকে প্ররোচিত করেছে মরচুয়ারি মন্দিরে সেনমুটের ছবি আঁকতে। এই কা-র দেহধারী আখটুমকে হত্যা করতে হবে। না হলে তোমার সমূহ বিপদ। এই কা তোমাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসবে।

'হত্যা করার পদ্ধতিও বাতলে দিলেন নিষ্ঠুর পুরোহিতের দল। হাটশেপসুট নিজের হাতে আখটুমের হৃৎপিণ্ডে তীক্ষ্ণ শলাকা বসিয়ে দেবেন। এবং সেই অবস্থাতেই তাকে মমি করে শায়িত রাখা হবে মরচুয়ারি মন্দিরের নীচে। রানি তাকে দেবেন এক কঠিন অভিশাপ, যাতে সে তার পাপের শাস্তি পায়। তারপর তাকে সমর্পণ করতে হবে মৃত্যুর দেবতা আনুবিসের হাতে।

'হাটশেপসুট পালন করলেন আমনরার নির্দেশ। সেই হতভাগ্য নিষ্পাপ বালককে নিয়ে যাওয়া হল মরচুয়ারি মন্দিরের নীচে এক গোপন কক্ষে। তারপর রানি তার হৃৎপিণ্ডে বসিয়ে দিলেন জেড পাথরের সুতীক্ষ্ণ শলাকা। অসহায় আখটুমের আর্তনাদ শুষে নিল কঠিন পাথরের দেওয়াল। রানি তাকে দিলেন এক ভয়ংকর অদ্ভুত অভিশাপ, তোমার কা-র কোনোদিন চিরমুক্তি ঘটবে না। সে মিশে যেতে পারবে না তোমার বা-র সঙ্গে। প্রতি যুগে সে নতুন শরীর ধারণ করবে তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। মৃত্যু জগতের প্রধান দেবতা হাথোরের ইচ্ছেয় যখন ছিদ্রপথে চাঁদের

BanglaBook.org

আলো এসে পড়বে তোমার শরীরে, নীলনদের জোয়ার আসবে, ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার কা নতুন দেহ ছেড়ে ঢুকবে তোমার পুরোনো শরীরে। তোমার শলাকাবিদ্ধ হৃৎপিণ্ড আবার সচল হবে। তখন ভীষণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাবে তুমি। এভাবে হাজার হাজার বছর ধরে তুমি তোমার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। তুমি কোথাও পালাতে পারবে না। তোমাকে আমি সমর্পণ করলাম মৃত্যুর দেবতা আনুবিসের হাতে। আদি-অনন্তকাল ধরে তিনি তোমাকে পাহারা দেবেন।'

আমি ডা. নাসেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বা আর কা কী?'

ডা. নাসের বললেন, 'প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন যে, ভেড়ার মাথাওলা দেবতা খুনুম মানুষের সৃষ্টিকর্তা। শরীর নশ্বর কিন্তু কা হল অবিনশ্বর, সে শরীর পরিবর্তন করতে পারে ও সর্বত্র বিরাজমান। অনেকটা আপনাদের দেশের আত্মার মতো কিন্তু আত্মার সঙ্গে কা-র একটা পার্থক্য আছে। তার দ্বৈত সত্তা কা ও বা। বা-ও অবস্থান করে শরীরের মধ্যে। সে নিয়ন্ত্রিত হয় কা-র দ্বারা। মিশর গবেষক পণ্ডিত রাইনহার্ড কা ও বা-কে যম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সে সময়কার মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন, শরীরের মৃত্যুর পর কা-র সঙ্গে বা মিশে গিয়ে অন্য লোকের উদ্দেশে পাড়ি জমায়। আর তার সঙ্গেসঙ্গেই মৃত ব্যক্তির মুক্তি ঘটে।'

কথাগুলো বলে কয়েক মুহূর্ত দম নিলেন ডা. নাসের। তারপর বললেন, 'প্যাপাইরাসে কী লেখা ছিল তা তো আপনারা শুনলেন! এবার বলি আমি অংশুর রেকর্ড করা ভয়েস শুনে তা থেকে এমন কী কথা উদ্ধার করেছিলাম, যাতে আমার মনে হয়েছিল তার সঙ্গে মরচুয়ারি মন্দির সম্পর্কিত প্যাপাইরাস বর্ণিত ঘটনার মিল আছে। অংশুর বক্তব্য আমি সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও টুকরো টুকরো শব্দ মিলিয়ে দুটো বাক্য আমি বুঝতে পারি। এক, আমি বা-র কাছে ফিরে যাব, সে ডাকছে আমায়। দুই, রানি তুমি অভিশাপ ফিরিয়ে নাও, আনুবিসকে চলে যেতে বলো। আশা করি, এবার আপনারা আপনাদের যাবতীয় প্রশ্নে উত্তর পেয়ে গিয়েছেন।' এই বলে তিনি চুপ করে গেলেন।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ডা. নাসেরকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, 'তাহলে অংশু সত্যিই কি...।' কিন্তু তার আগেই অংশু ফিরে

BanglaBook.org

এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ওখানে একটা লোক মূর্তি বিক্রি করছে। আমাকে একটা কিনে দেবে?'

পার্কের এক কোনায় রেলিংয়ের ধারে বসে একটা লোক নানারকমের ছোটো ছোটো পাথরের মূর্তি বিক্রি করছে। অংশুকে নিয়ে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তার সামনে। অংশু সাজিয়ে রাখা মূর্তিগুলোর মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট মূর্তি তুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আমি এটা নেব।'

মূর্তিটা খুব সুন্দর, কালো পাথরের তৈরি। সেটা দেখে আমি বললাম, 'এটা তো আনুবিসের মূর্তি, তোমার ভয় করবে না তো?'

আমার কথা শুনে অংশু কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর হেসে বলল, 'ভয় করবে কেন! আনুবিসের মূর্তি তো আমি মরচুয়ারি মন্দিরে অনেক দেখেছি।'

তার কথা শুনে আমিও হেসে পকেটে হাত ঢোকালাম আনুবিসের দাম মেটাবার জন্য।

পুনশ্চ অংশু এখন অনেক বড়ো। সামনের বছর সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ডা. ঘটকের বাড়িতেই এখন সে থাকে, মিশর থেকে ফিরে আসার পর। তার আর কোনোদিন ওই অসুখ হয়নি। ডা. ঘটকের বাড়িতে আমার আড্ডাও যথারীতি আগের মতোই চলছে। ডা. ঘটক বলেছেন, অংশুর মাধ্যমিক পরীক্ষার পর তিনি আবার আমাদের নিয়ে মিশর বেড়াতে যাবেন। সেখানে যাওয়ার জন্য মাঝে মাঝেই পত্রাঘাত করেন ডা. নাসের। আমার কিনে দেওয়া সেই পাথরের ছোট্ট আনুবিসের মূর্তিটা এখন শোভা পায় অংশুর পড়ার টেবিলে। সে মূর্তিটাকে পেপারওয়েট হিসেবে ব্যবহার করে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG